KANAKODI=R.NO.70735/99
April - July 2010 Rupees 10 only

পেয়েছি :-

১)	চলতে চলতে	বিমল গুড়িয়া
২)	সময়ের শব্দসাগর বিশ্বাস	
৩)	নরুণের বদলে বউ	মন্দার মুখোপাধ্যায়
৪)	অবেলার গান	অভী চৌধুরী
৫)	ইতিহাসে খিদিরপুর	সমর দত্ত
৬)	নিশিপাল	চিত্তরঞ্জন হীরা
৭)	পাণ্ডুলিপি, মেঘের হরফে বিশ্বজিৎ রায়	
৮)	অক্ষর আখ্যান	ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়
৯)	পরিবর্তন	শম্ভু ভট্টাচার্য
১০)	রাধাকান্তের জলছবি	গণেশ সাধুখাঁ
১১)	সুর	সোনালি বেগম
১২)	পক্ষীবিষয়ক	উপল মুখোপাধ্যায়
১৩)	অকিঞ্চন কথামালা	অনিল ঘোষ
১৪)	বিষাদ জরির কারু	সুভাষচন্দ্র ঘোষ
১৫)	যদি পেতাম দেবব্রত ঘোষ	
১৬)	শরীর সরণি	ব্রজেন্দ্রনাথ ধর
১৭)	বিষাদ বোধ	পরেশ সরকার

এখনো পাইনি :-

১)	মহাকবিতা সংগ্রহ	পবিত্র মুখোপাধ্যায়
২)	বেজে ওঠা সূর্যাস্ত	ধীমান চক্রবর্তী
৩)	ধীমানের চরাচর	-ঐ-
৪)	পাখি এক বৃত্তপদ্ধতি	আশিস গোস্বামী
৫)	জন্মগানের অবশিষ্টাংশ থেকে	ইন্দ্রনীল বিশ্বাস

শর্মিলা ঘোষ কর্তৃক ৩৯, আদি গঙ্গা কো-অপারেটিভ রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭০ থেকে প্রকাশিত এবং প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ৮ নরসিং লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত । **সম্পাদক - বিশাল ভদ্র ।**

কানাকড়ি

বর্ষ তেইশ (এপ্রিল - জুলাই), ২০১০

বর্ষ তেইশ (এপ্রিল - জুলাই), ২০১০

—ঃ এই সংখ্যায় ঃ—

প্রবন্ধ

মনসিজ মজুমদার : নিলামে রবীন্দ্রনাথ

সোনালি মুখোপাধ্যায় :
'ঘরে বাইরে' : উপন্যাস ও ঐতিহাসিক দলিল : প্রেক্ষাপট বঙ্গভঙ্গ

মনীন্দ্রনাথ আশ
শ্রমিক সংগ্রামে সংহতি ও সমবেদনায় রবীন্দ্রনাথ

গল্প

অঞ্জন সেনগুপ্ত : সুপারি বদল
জবা বিশ্বাস : ১৪১৭-র নববর্ষ ও একটি অনুভূতি
বিশাল ভদ্র : **এবং** ভুভুজেলা হাঃ হা

ক্রোড়পত্র

কবিতা - কবিতা (উত্তর-পূর্ব অঞ্চল)
দিলীপকান্তি লস্কর, শঙ্করজ্যোতি দেব, অভিজিৎ চক্রবর্তী,
অমিতাভ দেব চৌধুরী, সঞ্জয় চক্রবর্তী, বিকাশ সরকার,
স্বর্ণালি বিশ্বাস ভট্টাচার্য, অনিতা দাস ট্যান্ডন, প্রবুদ্ধসুন্দর কর

উত্তর পূর্বের কবিতা (প্রবন্ধ)— যশোধরা রায়চৌধুরি

সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধি মানুষের যত অনিষ্ট করেছে এমন বিষয়বুদ্ধি করেনি । বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয়, ধর্মমতের আসক্তি থেকে মানুষ তার চেয়ে বেশি ন্যায়ভ্রষ্ট অন্ধ ও হিংস্র হয়ে ওঠে... তার সর্ব -নেশে প্রমাণ ভারতবর্ষে আমাদের ঘরের কাছে প্রতিদিন যত পেয়ে থাকি এমন আর কোথাও নয় '

—***রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর***

সম্পাদক : বিশাল ভদ্র

☎

সঞ্চারিণী - ৯৮৩১১৬৪২২৭

E-Mail :- kanakodikolkata@yahoo.co.in

অক্ষর বিন্যাস : কানাকড়ি

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন আইনের ৮নং ধার অনুসারে বিজ্ঞপ্তি
প্রকাশস্থান: ব্লক-৫, ফ্ল্যাট-৭২, পি১৯ সাদার্ন অ্যাভেনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯
প্রকাশের কাল : ত্রৈমাসিক। ভাষা: বাংলা।
প্রকাশক, মুদ্রক, স্বত্ত্বাধিকারী: শর্মিলা ঘোষ(ভারতীয়)
সম্পাদক : বিশাল ভদ্র (ভারতীয়)
মুদ্রণ স্থান : প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ৮ নরসিং লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
রেজি. নং. — আর.এন.আই. ৭০৭৩৫/৯৯
(স্বাক্ষর) শর্মিলা ঘোষ (স্বত্ত্বাধিকারী)

মনসিজ মজুমদার

নিলামে রবীন্দ্রনাথ

দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে দেনা পরিশোধ করা দস্তুর ছিল এক সময়। বলা হত অমুকের সম্পত্তি লাটে উঠেছে। লাটে ওঠা? নিলেম হওয়া জিনিস ১নম্বর লট, ২নম্বর লট বলে উল্লেখ করা হত নিলাম ডাকার সময়। তাই সম্পত্তি নিলাম হওয় মানে লাটে ওঠা বোঝাত।

আজকাল অবশ্য ওই অর্থে নিলামে জিনিস বিক্রি হয় তা নয়। অনেকে নিজেদের সংগ্রহের বিরল জিনিস — বই, আসবাব পত্র, ছবি, কাঁচের বাসন ইত্যাদি নিলামে বিক্রি করেন। ধনীরা বহু অর্থ ব্যয় করে ওই সব জিনিস নিলাম ডেকে কিনে নেন। যেমন কিছুদিন আগে গান্ধিজির লেখা চিঠি আর তার চশমা বা টিপু সুলতানের তলোয়ার লন্ডনে নিলাম হয়েছিল।

আমরা প্রায় খবরের কাগজে পড়ি বিলেতে দুই প্রাচীন বিখ্যাত নিলামদারের নাম — সদেবি ও ক্রিস্টি। যাঁরা প্রতিবছর ছবি ও অন্যান্য কলাবস্তু কোটি কোটি টাকায় নিলাম করেন। পশ্চিমি শিল্পীদের বিখ্যাত ছবি এমন ভাবে নিলামে বিক্রি হয়। ইদানীং ভারতীয় বা দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পীদের ছবিও তাঁরা নিলামে বিক্রি করছেন। রবীন্দ্রনাথের বারোটি ছবি সম্প্রতি সদেবিতে নিলামে বিক্রি হল বারো কোটি টাকায়।

এই ছবিগুলি রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালে ইংল্যান্ডের ডার্টিংটন হল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা লেনার্ড এলম্‌হার্স্ট ও তাঁর স্ত্রী ডরোথিকে উপহার দিয়েছিলেন। এলম্‌হার্স্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব ছিল।

চিন ভ্রমণে এলম্‌হার্স্ট কবির নিত্যসঙ্গী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে এলম্‌হার্স্ট ইংল্যান্ডের ডেভনশায়ারে Dartington Hall Trust প্রতিষ্ঠা করেন যার আদর্শ আর প্রেরণা ছিল শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতন।

রবীন্দ্রনাথ লাটে উঠেছেন কথাটা একেবারে ফেলনা নয়। কারণ ডার্টিংটন হল ট্রাস্টের কাজ চালানোর প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্যেই ওই ছবিগুলিই নিলামে রেখেছেন। সদেবির ক্যাটালগে লেখা আছে, 'দক্ষিণ এশিয় ছবির সঙ্গে ডার্টিংটন হলের সম্পত্তি নিলাম হচ্ছে'

কিন্তু এই নিলামের খবর পেয়ে বাঙালি এমন মুষড়ে পড়েছিল যে মনে হয় ওই সম্পত্তি বাঙালির এবং বাঙালি দেউলিয়া হয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ নিলামে উঠেছেন। বাঙালি সাধ্যমত চেষ্টা

করেছে ওই ছবিগুলি যাতে ভারত সরকার কিনে নেন। বা নিলাম বন্ধ করা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন সেই মর্মে। আর সম্ভবত ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি নিস্ফল চেষ্টা করেছিলেন, সদেবিকে রবীন্দ্রনাথের ছবির নিলাম থেকে নিরস্ত করার, (পরে জানা গেছে এখবর মিথ্যা)। বোধহয় বাঙালির এই প্রয়াসের কারণ ২০০৮ সালে দিল্লির নির্দেশে লন্ডনে তদানীন্তন হাইকমিশনার গান্ধিজির কোন ব্যক্তিগত জিনিস সদেবির নিলাম থেকে কিনে নেন। কিন্তু পিকাসো বা ভ্যান গখের ছবি যখন নিলাম হয় তখন ওইসব শিল্পীদের স্বদেশের লোকদের কখনো এই রকম সোরগোল করতে শোনা যায়না। পৃথিবীর তাবড় আর্ট মিউজিয়মগুলি নিলাম থেকে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বহু অর্থ ব্যয় করে বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি কিনে নেয়। এমন ভাবেই পারির পিকাসো মিউজিয়ম, আমস্টারডামের ভ্যান গখ্ মিউজিয়ম গড়ে উঠেছে। অবশ্য অনেক ব্যাক্তিগত সংগ্রহ থেকেও দান হিসাবে ছবি এসেছে।

ওই ছবিগুলির নিলামে বাধা দেওয়ার বা ছবিগুলি স্বদেশে নিয়ে আসার পক্ষে বাঙালির যুক্তি এই যে ব্যক্তিগত সংগ্রহে চলে গেলে সাধারণের পক্ষে ওই ছবিগুলি দেখা আর সম্ভব হবেনা। কিন্তু সত্যিই কি সমস্যা রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখতে না পাওয়ার?

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথের ১৬০০ ছবি আছে। কিন্তু ওইসব ছবি দেখার জন্যে বাঙালির আগ্রহ বা আকুলতা কোনদিন দেখা যায়নি, দেখা গেলেও রবীন্দ্রভবনের গ্যালারি সাধারণের জন্যে খোলা থাকে না।

এতদিন বাঙালি দাবিও করেনি যে, রবীন্দ্রনাথের ওই ষোলশ ছবি নিয়ে কলকাতায় বা শান্তিনিকেতনে একটি উপযুক্ত রবীন্দ্রকলা মিউজিয়ম গড়ে উঠুক। যাতে দেশবিদেশের কলা রসিকেরা রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-পরিচিতি জানতে পারেন। এমন মিউজিয়ম হলেও যে দর্শকদের ভিড় লেগে থাকত মনে হয়না। বিশেষ করে যদি বিদেশের মিউজিয়মগুলির মত টিকিট কিনে সেই মিউজিয়মে ঢুকতে হত।

সদেবির নিলামের আর একটি ফলাফল এই যে স্বদেশে রবীন্দ্রনাথের সরকারি ও বেসরকারি খ্যাতির পরিমাপ পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির কাছে অবিসম্বাদী বিশ্বকবি। সরকার খুব ঘটা করে রবীন্দ্রশতবর্ষ করেছে, সার্ধশতবর্ষেও ধুম হবে খুব। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে তাঁর এই নোবেল প্রাইজ পাওয়া কবিখ্যাতি কতটুকু জনমানসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা আমরা আন্দাজ করতে পারি।

বাঙলার বাইরে কিছু শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠীর বাইরে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় বিশেষ তেমন কিছু পরিচিত নাম নয়। এবং আধুনিক ভারতীয় কলা ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম বড় মাপের শিল্পী সে পরিচয়ও যে এখনও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পায়নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সদেবির নিলামে কেবল কবিখ্যাতির জোরেই রবীন্দ্রনাথের ছবি ভারতীয় ধনী সংগ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে পারত। তার ওপর সচেতন সংগ্রাহকরা শিল্পী হিসেবে খ্যাতির টানেও সে ছবি কিনতে পারতেন। কিছুদিন আগেই ক্রিস্টির নিলাম থেকে একজন ভারতীয় ১৬ কোটি টাকায় সৈয়দ হায়দার রাজার ছবি কিনেছেন, সে ছবি তাঁর স্বদেশের বাড়ি আলো করে আছে।

কিন্তু সদেবির নিলামে কোন ভারতীয় ধনী একটি কি দুটি ছবিও এক কোটি কি দু কোটি টাকায় কেনার জন্য নিলামের ডাকে সাড়া দেন নি। রবীন্দ্রনাথের ছবি না হয়ে যদি টিপু সুলতানের উষ্ণীষ হত তাহলে হয়তো বিজয় মাল্যের মত কোন ধনী তা কিনে নিতেন। কিছুদিন আগেই তিনি গান্ধিজির চশমা আর টিপুর তরবারি কিনেছেন সদেবির নিলাম থেকে।

মনে রাখা দরকার সদেবির নিলামের ডাকে কোন ভারতীয় বাঙালি ধনীও সাড়া দেননি। কোন বাঙালি সর্বভারতীয় নেতা কোন ভারতীয় শিল্পপতিকেও উদ্বুদ্ধ করেননি ওই ছবিগুলি কিনে নিতে। বিশ্বের ডলারের অঙ্কের ধনীদের মধ্যে ভারতীয়রাও আছেন, এবং এক আধজন বাঙালি ধনী তাঁদের মধ্যে না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের ছবি কেনার গৌরব অর্জনের জন্যেও সদেবির নিলামের ডাক ধরতেই পারতেন।

যে দুজন বাঙালি ছবি কিনেছেন তাঁরা কেউ ভারতীয় নন। একজন অনাবাসী ও আর একজন বাঙলাদেশী। ওপার বাঙলার ওই বাঙালির মত বা তার চেয়ে ধনী এপার বাঙলায় কোন রবীন্দ্রানুরাগী নেই সে কথাই কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? বাঙালির রবীন্দ্রানুরাগ যে কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ডার্টিংটন হলের বারোটি ছবি যদি বাঙালির কাছে ফিরে আসত আমরা কি তার সযত্ন সংরক্ষণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারতাম?

রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহে আছে ট্রাঙ্ক বোঝাই অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথে ছবি। সেগুলির অনেকগুলি কীটদষ্ট। তাছাড়া আমরা রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ যখন রাখতে পারিনি তখন রবীন্দ্রনাথের ছবিও রাখতে পারবো এমন ভরসা কোথায়!

সোনালি মুখোপাধ্যায়

‘ঘরে বাইরে’ : উপন্যাস ও ঐতিহাসিক দলিল : প্রেক্ষাপট বঙ্গভঙ্গ

‘এতদিন আমরা মুখে বলিয়া আসিয়াছি : জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গদপি গরীয়সী, কিন্তু জন্মভূমির গরিমা যে কতখানি তাহা আজ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তেমন কি পূর্বে আর কখনো হইয়াছিল? এ কি কোনো বক্তৃতায়, কোনো উপদেশে ঘটিয়াছে? তাহা নহে, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষস্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এক আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম — বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই’ (‘বিজয়া সম্মেলন’)

বহু পরিচিত এই উদ্ধৃতাংশটুকুর বক্তা হলেন রবীন্দ্রনাথা ঠাকুর। ১৯০৫ সালেন ১৬ই অকটোবর বাংলা ব্যবচ্ছেদ কার্যকর হবার সাতদিন আগে বাগবাজারনিবাসী পশুপতি বসুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রাণবন্ত আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন সেখান থেকেই অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এই ঐতিহাসিক বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করা। বাঙালির জাতীয়তাবাদী সচেতনতাকে প্রতিরোধের যে ঘৃণ্য চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা, রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র প্রতিবাদ করেন বিবিধ ভাষণে। প্রাগুক্ত প্রবন্ধ ছাড়াও উল্লেখ করতে পারি ‘অবস্থা ও ব্যবস্থা’র কথা। ১৯০৫-এর ২৫শে আগস্ট অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বিদেশি দ্রব্য বয়কট এবং স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণের নীতিকে সমর্থন করে বলেন, ‘যে সংকল্প করিয়াছি সেই সংকল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে।’

বাংলাদেশের আকাশে যখন বঙ্গভঙ্গের মতো কুটিল অভিশাপ পুঞ্জীভূত, তখন রবীন্দ্রনাথের এই সঞ্জীবনী মন্ত্র স্বদেশি নেতাদের প্রাণিত করেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর স্বয়ং রবিঠাকুর যখন রাখীবন্ধন উৎসবে অংশগ্রহণ করেন তখন বয়কট বা স্বদেশি আন্দোলনের সাফল্য নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। কিন্তু এরপরই ছন্দপতন ঘটে — ‘রবীন্দ্রনাথ এই রাজনৈতিক কর্ম ও উত্তেজনার সামিল ছিলেন মাত্র মাস তিনেকের জন্য; তারপর তিনি অসংখ্য মানুষকে বিস্ময় বিমূঢ় করে স্বদেশি আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান।’ (অরবিন্দ পোদ্দার - ‘রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব’)

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথের নিষ্ক্রমণ নিয়ে আজ পর্যন্ত বহু বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কোথাও বিশ্বকবি সমর্থন পেয়েছেন, কোথাও জুটেছে অসমর্থন। সমালোচকদের সেই

সমস্ত বক্তব্য এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের নিষ্ক্রমণকে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করব তাঁরই সৃষ্টি 'ঘরে বাইরে'র আলোকে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ১৯১১-তে। এরও কয়েক বছর পর ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় প্রথমে ১৯১৬ খ্রি., তারপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।

নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপকে কেন্দ্র করে রচিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চালচিত্র নির্মাণ করেছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন, প্রধান তিন চরিত্রের সংক্ষুব্ধ অন্তর্লোকের সঙ্গে বহির্লোকের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের যোগ অত্যন্ত প্রকট সমগ্র উপন্যাস জুড়ে স্বদেশি আন্দোলনের অসঙ্গতিকে নিপুনভাবে উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নামে কিভাবে আত্মহননের নির্মম খেলায় মেতেছিল বাঙালি, উপন্যাসে তারই বাস্তব বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশেষত স্বদেশি নেতাদের চরিত্র ও কর্মোদ্যম নিয়ে গভীর সংশয় বিরোধী আন্দোলন থেকে হয়েছে উপন্যাসে। এঁদের কর্মপ্রবাহে বীতশ্রদ্ধ হয়েই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে নিস্কৃতি নিতে বাধ্য হন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'ঘরে বাইরে'র গঠনগত বৈশিষ্ট্য মূলত দুটি, উপন্যাসটি চলিত ভাষায় রচিত। এবং চরিত্রগুলির আত্মকথন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম চলিত ভাষারীতির উপন্যাস। আত্মকথনের সুযোগ থাকায় চরিত্রগুলি নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে কখনো নিজের দর্পনে, কখনো অন্যের দর্পনে।

এরপর আসা যাক নামকরণ প্রসঙ্গে, 'ঘরে-বাইরে' — নামটি বিশ্লেষণ করলে বহু তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, বিমলার ঘর ও বাইরের ভারসাম্যহীনতাই উপন্যাসের নামকরণের প্রথম ও প্রধান তাৎপর্য। বিমলার ঘরের পরিধি সংকীর্ণ হলেও সেখানে মুক্তির অভাব ছিল না। সাধারণ জমিদারবাড়ি মেয়েদের জন্য যেটুক অন্দর মহল নির্ধারিত থাকে বিমলারও সেটুকু ছিল, অতিরিক্ত পাওনা ছিল স্বামী নিখিলেশের প্রেম ও ঔদার্য। স্ত্রীকে নিয়ে তার মনে কোনও কুসংস্কার ছিল না। খানিকটা ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের মতোই স্ত্রীকে বহির্বিশ্বে আনাতেও নিখিলেশের আপত্তি ছিল না। বরং বিমলাই সহজাত সংকোচ ভেদ করে বাইরে বেরোতে পারেনি। তার সংকোচের কঠিন আবরণকে এক মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় সন্দীপের ব্যক্তিত্ব। স্বামীর একান্ত প্রিয় বন্ধু সন্দীপের বাগ্মীতা, উচ্ছলতা, সৌন্দর্য বিমলার অন্তর্লোকে যে তীব্র আসক্তির জন্ম দিয়েছিল তারই সংক্ষোভে ঘরে বাইরের সমস্ত আশ্রয় হারিয়ে মানসিকভাবে নিঃস্ব হয়ে যায় বিমলা।

চরিত্রগুলির মানসিক টানাপোড়েন গুরুত্ব পেলেও 'ঘরেবাইরে' মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস। বিমলাকে কেন্দ্র করে নিখিলেশ ও সন্দীপের মধ্যে যেমন মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চলেছে, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়েও তেমন উভয়ের মধ্যে প্রবল সংঘাত বেঁধেছে। উপন্যাসটির পাঠকমাত্রই বুঝতে পারে নিখিলেশ চরিত্রটি কল্পিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের আদলে এবং সন্দীপ নির্মিত হয়েছে বাকসর্বস্ব স্বদেশি নেতাদের ছায়ায়। এছাড়াও চন্দ্রনাথবাবু, হরিশ কুণ্ডু, অমূল্য, স্বদেশি তরূণদল প্রত্যেকেই বঙ্গ

ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নানা স্তরের প্রতিনিধি।

এবার আসা যাক উপন্যাসের রাজনৈতিক প্রসঙ্গে। 'বিমলার আত্মকথা' দিয়ে উপন্যাসের শুরু। সেখানে নিখিলেশ বিমলার মধুর যৌথজীবনের সমান্তরালে আসন্ন রাজনৈতিক অশান্তির সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। নিখিলেশের গঠনমূলক স্বদেশ ভাবনার কথা, সন্দীপের কথা যেমন রয়েছে তেমন আছে মিস্ গিলবির প্রসঙ্গ। শুধুমাত্র বিদেশিনী বলেই নিখিলেশের এক তরুণ তাঁকে ঢিল মেরে অপমান করে। ঘটনাটিতে বিমলার প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকলেও নিখিলেশ কঠোর হাতে ছেলেটিকে শাস্তি দেয়। এর পরিণামে নিখিলেশকে স্বদেশি কাগজগুলি অযথা অপমানও করে। ঘটনাটি সামান্য অথচ গভীর তাৎপর্যবহ। আমরা বুঝতে পারি নিখিলেশ স্বদেশব্রতী, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার ঘোরতর বিরোধী। তাঁর বক্তব্য — 'গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।' (ঘরেবাইরে)।

বলা বাহুল্য এ হল দেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের স্বর —'চকমকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না।...যখন শুদ্ধমাত্র ঘনঘন চকমকি ঠোকার চাঞ্চল্যমাত্রেই সকলেই আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি, তখন সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিইে হইবে, এমন করিয়া কখনোই ঘরে আলো জ্বলিবে না, কিন্তু ঘরে আগুন লাগা অসম্ভব নহে।' ('পথ ও পাথেয়', ১৩১৫)

আগুন লাগানোকে রবীন্দ্রনাথ ভয় পেয়েছিলেন। স্বদেশি ব্রত, বয়কট আন্দোলন প্রভৃতির উত্তেজনায় বিবিধ বিশৃংখলা ও অসংগতির উদ্ভব হয়েছিল। নিখিলেশ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়-ই এই অসংগতিকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি। মিস্ গিলবিকে অপমান করার মধ্যে উচ্ছৃংখলতাই প্রকট হয়েছিল। স্বদেশ প্রেমের নামে সংঘটিত অন্যায়গুলি দেখে রবীন্দ্রনাথ একসময় আন্দোলন সম্পর্কে নীরব হতে বাধ্য হন।

'ঘরে বাইরে' — উপন্যাসে নিখিলেশের প্রতিস্পর্ধী শক্তির নাম সন্দীপ। সেকালের স্বদেশি নেতার আদলে তার নির্মাণ। সন্দীপ সুপুরুষ, বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতায় এবং 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রোচ্চারণ ভঙ্গিতে আবালবৃদ্ধবণিতা সম্মোহিতত হয়। প্রথম দর্শনেই বিমলা মোহাবিষ্টর মতো সন্দীপের কাছে নিজেকে সমর্পন করে দেয়। 'যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তার অভ্যাস।' (প্রাগুক্ত)

সন্দীপ বুদ্ধিমান কৌশলী পুরুষ, অন্যকে জয় করার একাধিক তূণ সঞ্চিত ছিল তার কাছে। অল্পবয়সী তরুণদের সে জয় করেছিল দেশপ্রেমের উগ্রমোহ বিস্তার করে। আর বিমলাকে করগত করে দেশপ্রেম ও কামনার মিশ্র মাদকতা ছড়িয়ে, প্রাথমিক ভাবে বিমলা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল সন্দীপের ব্যাপারে। বরং নিখিলেশকে দূরে সরিয়ে দেয় সে। সন্দীপের অন্ধস্তুতিতে তার অন্তর্লোক ও বহির্লোক দুইই গভীরভাবে আলোড়িত থাকে। মুছে যায় ঘর ও বাইরের ব্যবধান। অসংকোচে বলে — 'সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে

আমি যে আশ্চর্য, সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর-ঘন্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিল।'(প্রাগুক্ত)

বিমলার আবেগ অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নিয়মিত যোগাযোগের পর সন্দীপের চারিত্রিক অসঙ্গ তিগুলি তার কাছে প্রকট হতে থাকে — 'আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি, প্রথমে না হোক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে, সন্দীপের মধ্যে যে জিনিষটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্যমাত্র।' (প্রাগুক্ত)

তবুও বিমলা মোহমুক্ত হতে পারে নি। ঘোর সম্পূর্ণ ভাঙার পূর্বেই সন্দীপ তাকে দিয়ে মারাত্মক অন্যায় করিয়ে নেয়। দেশসেবার জন্য বড়ো অঙ্কের টাকা দাবি করে সন্দীপ। বিভ্রান্ত বিমলাকে সে চুরি করতে প্ররোচনা দেয়। নিখিলেশের টাকা আসলে দেশেরই সম্পদ, সেকথা বুঝিয়ে দেয় বিমলাকে — 'আমি বললুম, তা হলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের। ... যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। বন্দেমাতরম।' (প্রাগুক্ত)

সন্দীপের তত্ত্ব বিমলাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। সন্দীপের কর্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে সে চুরি করে। কিন্তু একই সঙ্গে সন্দীপের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। অমূল্য বা নিখিলেশের তুলনায় সন্দীপকে অতি সাধারণ মনে হয় বিমলার। আবারও স্বামীকে শ্রেষ্ঠ মনে হয় তার। শুরু হয় কোলকাতায় যাবার আয়োজন। কিন্তু সে যাত্রা সম্ভব হয় না। তার আগেই দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিখিলেশ মারাত্মক আহত হয়ে বাড়ি আসে। ভাগ্যের প্রতীক্ষারত বিমলাকে দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে যায়।

বিমলার সূত্রে বলা যায়, উপন্যাসের চরিত্রর দায়িত্ব হল নিজেকে বিকশিত করা এবং একই সঙ্গে অপরকে বিম্বিত করা। বিমলা চরিত্রটি সেই দায় যথাযথ ভাবে পালন করেছে। নিজের অসঙ্গতির সমান্তরালে সে সন্দীপকেও প্রকট করেছে। স্বদেশি নেতাদের স্থূল মানসিকতাকে উন্মোচন করেছে তার আর সন্দীপের সম্পর্ক।

শুধু বিমলা প্রসঙ্গে নয় সন্দীপের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের উগ্র উন্মাদনাকে বিশ্বকবি সমর্থন করেন নি। আন্দোলন এবং দেশসেবার নামে অভাবনীয় অন্যায় ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ম দিয়েছিল স্বদেশি নেতৃগণ। বয়কট আন্দোলনের সময় বহু গরিব বিলাতি পণ্য বিক্রেতা উৎপীড়িত হয়েছিল। স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। তরুণ প্রজন্মর পঠন পাঠনের আগ্রহ হারিয়ে যায়। তার সঙ্গে ছিল ব্রিটিশ সরকারের নিপীড়নের সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ এই বিশৃংখলায় মাত্রাধিক উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, '...অনাবশ্যক বিরোধ অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাঁহারা কর্মযোগী, অত্যাবশক কন্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিতা! (সভাপতির ভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী)

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের বক্তব্যই নানাভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। সন্দীপের মতো দেশসেবকদের উদ্দেশ্যে নিখিলেশ বলেছে — 'দেশের নামে ত্যাগ যারা করে তারা সাধক, কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যার করবে তারা শত্রু; তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে আগায় জল দিতে চায়।'(ঘরে বাইরে)

নিখিলেশের মতোই চন্দ্রনাথবাবু বলেছেন - 'যারা ব্রত নিয়েছে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েছে।' (প্রাগুক্ত)

স্বদেশি আন্দোলনের বকলমে অনাচার কতটা প্রসারিত ছিল 'শুকসায়রের হাট কেন্দ্রিক ঘটনাবলি তার জ্বলন্ত নিদর্শন। হাটে বিলাতি জিনিস ক্রয় বিক্রয় বন্ধের জন্য সন্দীপ রীতিমতো বলপ্রয়োগের পথ নেয়। পঞ্চুর মতো গরিব ব্যবসায়ীদের সামান্য পণ্যকে পুড়িয়ে দেয় স্বদেশ ব্রতীরা - 'সেখানে সন্দীপ ছিলেন, ... বললেন ভাইসব বিলিতি ব্যবসার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র। এই ছাই গায়ে মেখে ম্যান্‌চেস্টারের জাল কেটে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরোতে হবে।'(প্রাগুক্ত)

হাটে স্বদেশি দ্রব্যকে জনপ্রিয় করতে ষড়যন্ত্র ও অন্যায় কৌশল প্রয়োগ করে সন্দীপ - 'খবর এই হাটে কুণ্ডুদের যেসব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেছে।... মারোয়ারিরা বলছে, আমাদের কাছ থেকে কিছু দন্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানরা কিছুতেই বাগ মানছে না।' (প্রাগুক্ত)

মুসলমানদের বিরুদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য সন্দীপ মারাত্মক অন্যায় করে। গরিব মিরজানের নৌকো ডুবিয়ে দেয় তারা। এই ধরণের ঘটনাবলি মুসলমানদের ক্রুদ্ধ করে তোলে। তারই বিস্ফোরণ ঘটে দাঙ্গায়। চন্দ্রনাথবাবু বার্তা আনেন - 'মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেছে। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্যে ভয় ছিল না, কিন্তু মেয়েদের তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।'(প্রাগুক্ত)

সন্দীপ, হরিশ কুণ্ডু এবং উন্মত্ত স্বদেশিদের অন্যায় অত্যাচারের পরিণামে এই অরাজকতার জন্ম হয়। নিখিলেশ এবং চন্দ্রনাথবাবু যে বিষয়ে আশংকিত ছিলেন বাস্তবে তাই ঘটে। দাঙ্গার সংবাদ পেয়ে নিখিলেশ ঘটনাস্থলে রওনা দেয়। দাঙ্গার ভয়াবহতা কম ছিল না - 'দূর গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহু দূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন কেঁপে উঠতে লাগল।' (প্রাগুক্ত)

এই পরিস্থিতির মধ্যেই স্বামীর জন্য অনন্ত প্রতীক্ষায় বসে থাকে বিমলা। একসময় অপেক্ষার অবসান হয়। আহত নিখিলেশ বাড়ি আসে। বিমলার কানে পৌঁছয় অশনি সংকেত - 'কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।

আর অমূল্যবাবা?

তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল, তাঁর হয়ে গেছে।'(প্রাগুক্ত)

স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের অভ্রান্ত পরিণাম ছিল এই বিশৃংখলা। আন্দোলনকারীদের অসংযত চেহারাকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে বলেছিলেন - 'আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানিনা এবং অনেকে স্বীকার কর্তে অনিচ্ছুক যে বয়কট ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে।... পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে, তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।' ('রাজা প্রজা' - 'পথ ও পাথেয়')

সর্বব্যাপী অসংযমের নগ্ন চেহারা অঙ্কিত হয়েছে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। শুধু স্বদেশি আন্দোলন নয়, যে কোনও সময়ের বিশৃংখল রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রযোজ্য। তার প্রতিক্রিয়ায় আরও অজস্র সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অমানবিক মুখ ও পথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অতি দ্রুত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং দেশসেবার মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেছিলেন। তারপর বেশ কয়েকবছর পর স্বদেশি কর্মকাণ্ডের সার্বিক বিশৃঙ্খলার বাস্তব চিত্রকে আবার আঁকলেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। প্রায় সমকালীন দেশব্রতীদের এমন নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করার সৎ সাহস বোধহয় একমাত্র বিশ্বকবির ছিল। সেই সূত্রেই 'ঘরে বাইরে' শুধু উৎকৃষ্ট উপন্যাস নয়, বঙ্গভঙ্গ যুগের নির্ভীক ঐতিহাসিক দলিল হবার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র: (১) রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত - ৮ম ও ১৩শ খন্ড
(২) রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব - অরবিন্দ পোদ্দার, প্রত্যয়, তৃতীয় প্রকাশ ১৪৯৯

মনীন্দ্রনাথ আশ

শ্রমিক সংগ্রামে সংহতি ও সমবেদনায় রবীন্দ্রনাথ

এখন বিশ্বায়নের তরঙ্গ বইছে দেশে দেশে। সর্তসাপেক্ষ — নির্দেশিত ঋণ গ্রহণের বোঝা, উন্নয়নশীল দেশে, আবার অসম প্রতিযোগিতায় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। ছোট-বড় শিল্প সংস্থাগুলো আজ নানা কারণে মৃতপ্রায়। গঙ্গার দুপাশের বৃহৎ চটশিল্পগুলো বিপন্ন। স্বভাবতই মালিক-শ্রমিক নিয়ত অশান্তি ঘটছে। কখনও সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হলেও তা সুদূর প্রসারি হচ্ছেনা, ফলে অনিবার্য হয়ে পড়ছে শ্রমিক অসন্তোষ।

ইংরেজ আমলে বিদেশী ব্যক্তিমালিকানায় চট শিল্পের রমরমা অবস্থা, কেননা ভারতের আর কোথাও অন্য কোনো শিল্পে তখন এত অধিক মুনাফা হতো না। (এশিয়ার মধ্যে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় হুগলি জেলার অন্তর্গত রিষড়ায় ১৮৫৫ সালে)। কিন্তু শ্রমিক-মালিক অবস্থার তারতম্য ছিল প্রায় আকাশপাতাল।

দেশের মধ্যে তখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে, তাতে শ্রমিকরাও অল্পবিস্তর প্রভাবিত। আবার নানান অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, ন্যায্য দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে মিলেমিশে গণজাগরণে তা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। মিল মালিকদের একের পর এক অন্যায় সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯২৮ সালে ভারতীয় চটকল সমিতি সপ্তাহে কাজের সময় ৫৪ থেকে ৬০ বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেয়, তার ফলে শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্মঘট শুরু হয় হাওড়ার বাউড়িয়ায় ১৭-ই জুলাই থেকে ৩১-শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর প্রতিক্রীয়া ঘটল আবার উত্তর ২৪ পরগনার শিল্পাঞ্চল ভাটপাড়ায় ১৯২৯ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে। তবে এবারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত না থেকে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে অর্থাৎ আন্দোলন বিভিন্নস্থানে শুধু বিস্তার লাভ করেনা, তা বিরাট আকার ধারণ করে এবং ব্যাপক জন সমর্থনে পুষ্ট হয়ে ক্রমশ তা সাধারণ ধর্মঘটের রূপ নেয়। সংশ্লিষ্ট শ্রমিক নেতারাও ধর্মঘট সফল করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রচার অভিযান শুরু করেন। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও শ্রমিকদের স্বপক্ষে তাঁদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ভাবতে অবাক লাগে সন্ন্যাসী স্বামী বিশ্বানন্দর মত ব্যক্তিও সেদিন শুধু সমর্থন নয়, এমন কি পিকেটিং-এ সামিল হয়েছিলেন (১৩ অগস্ট — অমৃতবাজার পত্রিকা) উল্লেখ করেছে, 'মোটরযোগে তিনি হুগলি জেলার তেলেনীপাড়ায় গিয়ে এ্যাঙ্গাস চটকলে পিকেটিং সংগঠিত করেন।'

ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে বেশ কিছু মানুষ ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু অন্যদিকে তাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ বিক্ষোভে ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠতে থাকে, দেশের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখে কবি বারেবারে ব্যথিত হয়েছেন, বিচলিত হয়েছেন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের জালিওয়ানওয়ালাবাগে বর্বরোচিত আক্রমণ, বঙ্গ-ভঙ্গ আইন ইত্যাদির প্রতিবাদে আপোষহীনভাবে সোচ্চার হয়ে তিনি পথে নেমেছেন।

কবি কলকাতার এক ঐতিহ্য পূর্ণ ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের বাড়ির যোগসূত্র ছিল। কবি এক সময় অক্ষেপ করে বলেছিলেন, তাঁর কবিতা বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হয়নি। এটা কবির বিনয়ী মনোভাবের পরিচয়। কারণ আমরা দেখেছি, দেশের মধ্যে নানান ঘটনা কবির মনকে বারেবারে নাড়া দিয়েছে। তাঁর প্রতিক্রিয়ার রূপান্তর ঘটেছে তাঁর সাহিত্য কর্মে, কবিতার ভাষায় — 'আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ।'

গত শতকের তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে কবির সোভিয়েত রাশিয়া সফর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উন্নততর সমাজ গঠনে ও সর্বতোমুখি মানব কল্যাণে এক নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে তখন

সেখানে। কবি সচক্ষে দেখে অভিভূত।

এদিকে ১৯২৯ সালের পর হ্রাস-মজুরি পুনরুদ্ধার ও মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে বাংলার চটকল শ্রমিকরা ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবার এক ঐতিহাসিক ধর্মঘট শুরু করে, তখন বাংলাদেশ ফজলুল হক নেতৃত্বাধীন একটি কোয়ালিশন সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন। মূল ধর্মঘট শুরু হয়েছিল হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগণার ১৯টি চটকলে। কোয়ালিশন সরকারের ঔদাসীনতা সত্ত্বেও ধর্মঘট এগিয়ে চলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করেন এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য। এই সময় সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষ শ্রমিকদের সাহায্য ও সমর্থনে এগিয়ে আসেন। বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘটি শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুরাবস্থা দেখে, তাদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন স্থানে রিলিফ কমিটি বা ত্রান তহবিল খোলা হয়। এই উপলক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়াও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, শরৎচন্দ্র বসু, ডা: বিধানচন্দ্র রায়, রাধারমন মিত্র প্রমুখ অগণিত স্বনামধন্য ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন ও সাহায্যের জন্য আন্তরিক ভাবে আবেদন রাখেন। এক্ষেত্রে গান্ধিজি অনেকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।

মালিকরাও শ্রমিকদের দৃঢ় ঐক্য ও মনোবল দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে ও নানা ঘৃণ্য অপকৌশল গ্রহণ করে, যেনতেন প্রকারেন এই ধর্মঘটকে বানচাল করবার জন্যে এদিকে মালিক সমিতি (আই.জে.এম.) তুরুপের তাস হিসাবে গান্ধিজির ছবিকে ব্যবহার করে, উদ্দেশ্য হল এই আন্দোলনে গান্ধিজির সায় নেই। গান্ধিজির অজ্ঞাতসারে তাঁর ছবি ও পোস্টার সর্বত্র প্রচার ও বিলি করেন। পরে গান্ধিজি একথা জানতে স্বীকার করেন যে, ওরা আমার বিনা অনুমতিতেই একাজ করেছে। এ বিষয়ে আমার পরামর্শ, উভয় পক্ষর বিরোধ মিটিয়ে ফেলা ভাল।

প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও মানবদরদী কবি এই সময় চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। কবি শ্রমিকদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তাঁর উপলব্ধি সকলের হৃদয়কে গভীরভাবে আপ্লুত করে। কবির মর্মস্পর্শী আবেদন — ‘ ফেব্রুয়ারি থেকে ধর্মঘটের ফলে শত সহস্র শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার খবর জেনে আমি গভীরভাবে ব্যথিত। দুর্দশা শুধু শ্রমিকদেরই হয়নি, তাদের পরিবারের মহিলা ও শিশুদেরও হয়েছে। উচ্চতর বেতন ও কাজের অধিকতর মানবিক পরিবেশের দাবি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। পশ্চিমের প্রতিটি গণতন্ত্র দেশে সরকার জনসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখে। নতুন সংবিধান অনুসারে গঠিত মন্ত্রীদের কাছে, হাজার হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারের লোকজনের জীবন সম্পর্কিত বিষয়টি তাঁরা বিবেচনা করবেন। তাদের প্রতি যাতে ন্যায় বিচার হয় তা কি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না? যাঁরা সমাজের বোঝা বয় সমাজ তঁদের প্রতিপালন করবে এটাই মানবিকতার দাবি। ধর্মঘটকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য কুৎসিত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকে প্রতিটি ন্যায়পরায়ন লোকেরই নিন্দা করা উচিৎ। চটকল শ্রমিক ও তাঁদের অসহায় পরিবারে পরিজনের এই দুঃখ-কষ্টের দিনে সাহায্য করার জন্যে আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করছি।’ (অমৃতবাজার পত্রিকা — ৩০ এপ্রিল ১৯৩৭)

এরপর মালিক পক্ষ মরিয়া হয়ে ওঠে ধর্মঘট ভাঙার জন্য। ক্রমবর্ধমান হয় অত্যাচার, অনেক স্থানে নির্বিচারে গুলিও চলে। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের মনোবল ভাঙা যায়নি। অগত্যা সরকার এবং মালিকপক্ষ দেশবাসীর সমর্থন ধন্য শ্রমিকদের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। শ্রমিকরা জয়লাভ করেন। অবশেষে এই ঐতিহাসিক সফল ধর্মঘটের অবসান ঘটে ১৯৩৭ সালের ১০-ই মে তারিখে (শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস — ড: পঞ্চানন সাহা)। রবীন্দ্রনাথ তাই চির প্রাসঙ্গিক।

অঞ্জনকুমার সেনগুপ্ত

সুপারি বদল

সাদামাটা চেহারা লোকটির। রঙটা ঈষৎ ফরসা। গালটা ফোলা ফোলা হওয়ায় চোখ দুটো একটু ভিতরে ঢোকা। একটা হালকা নিষ্ঠুরতার আভাস রয়েছে নিষ্প্রাণ চোখ দুটিতে। ভিড়ের মধ্যে সহজে নজরে পড়বে না এমন লোককে। দরজার সেফটি চেনটা খুলে মুকুন্দ বললেন, ‘‘আসুন।”

ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল লোকটি। হাতে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ রয়েছে তার। জিনিসটি দামি। অভিজাত লোকেরাই সাধারণত ব্যবহার করে এই ধরনের ব্যাগ। সোফার দিকে হাত দেখাতেই সেন্টার টেবিলের ওপর ব্যাগটি রেখে সোফায় বসে পড়ল লোকটি। মুকুন্দ উলটো দিকে বসলেন। টেবিলের ওপর মুকুন্দর সান্ধ্যকালীন পানীয়র বোতল। পাশেই গ্লাসটায় সবে এক পেগ ঢেলেছিলেন। চুমুক দেওয়া হয়নি। লোকটার চোখ এড়াল না। ‘‘একা একাই খাচ্ছিলেন?” খুব নিচু গলায় প্রশ্ন করল আগন্তুক। শব্দের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ এতটাই যে মুকুন্দর মনে হল যে ওর পিছনে যদি কেউ থাকত তা হলে সে প্রশ্নটা শুনতেই পেত না। যেন ওর কান অবধিই শব্দটার পৌঁছনোর কথা।

‘‘হ্যাঁ।” লোকটির চোখে চোখ রাখলেন মুকুন্দ।

‘‘এই সময় আমি কারো সাথে দেখা করি না।”

‘‘জানি।” অদ্ভুত একটা হাসি খেলে গেল লোকটির ঠোঁটে।

‘‘চলবে?” নিজের গ্লাসটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মুকুন্দ।

‘‘না স্যার। কাজের সময় আমি ড্রিংক করি না। আপনার সব খোঁজখবরই আমি নিয়ে এসেছি। তার দু-একটা হয়তো আপনারও জানা নেই।”

কৌতুক বোধ করলেন মুকুন্দ। মুকুন্দ পাটোয়ারি, লোকের সম্বন্ধে সঠিক খোঁজখবর রেখেই তারও ব্যাবসার সমৃদ্ধি। মানুষ সম্বন্ধে জানা না থাকলে আজকাল ব্যাবসা করাই সম্ভব নয়। পৈতৃক ব্যাবসার ভাগে হাওলার দিকটাই তার ভাগে পড়েছে। গত বারো বছরে মুকুন্দ ব্যাবসাটাকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সেটা সম্ভব হয়েছে অবশ্য তার শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্যও। গত পনেরো বছরে ভারতবর্ষে ব্যাবসার ধরন-ধারন বদলেছে। সময়মতো লাইনে এসে পড়েছেন পিতৃদেব সময়মতো বিদায় নেওয়ায়। এখন তাঁর সম্বন্ধে ইনকাম ট্যাক্স বা ডাইরেক্টর অব রেভিনিউজ— এরা খোঁজখবর রাখে। এই বিশেষত্ববিহীন লোকটাও তাঁর খোঁজ রাখছে শুনে মজাই লাগল। বললেন,

‘‘তাই নাকি? যেমন?”

‘‘‘যেমন আপনার রক্ষিতা রমলা নন্দী। এখন আপনি একাই ওর ক্লায়েন্ট নন।”

মিটমিট করে হাসতে থাকল লোকটি।

নিমেষের মধ্যে কৌতুকের ভাবটা উধাও হল মুকুন্দ-র। বলল, ''এই কথাটা বলার জন্য আপনি বার বার ফোনে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছিলেন? আমি কিন্তু চুকলিবাজি পছন্দ করি না।''

''সেও আমি জানি। আমার উদ্দেশ্য আলাদা।'' হাত বাড়িয়ে ব্যাগটি তুলে ব্যাগের চেনটা খুলতে শুরু করল সে।

''প্রমাণ আছে কোনো আপনার কাছে?'' মুকুন্দ জিজ্ঞেস করল।

''প্রমাণ-ট্রমান দিতে আমি আসিনি স্যার।''

''তবে ঠিক কী জন্য এসেছেন সেটা বলে তাড়াতাড়ি সরে পড়ুন। কীসের ব্যাবসা আপনার?''

কয়েক মুহূর্ত লোকটি তার মুখের দিকে মরা মাছের চোখ তুলে তাকিয়ে রইল। তার পর বলল, ''ব্যাবসা নয়। কারো চাকরি-বাকরিও করি না! আমার কাজ লোক অসুবিধেয় পড়লে সার্ভিস দেওয়া।'' বলতে বলতেই ব্যাগ থেকে একটা রিভলভার বার করল সে।

''স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন স্যার। পয়েন্ট থ্রি এইট।'' চেম্বারটা এক পাশে বার করে বোঁ করে ঘুরিয়ে দিল। ''ছটা গুলিই আছে দেখছেন?''

মুকুন্দ চট করে ঘাবড়াবার লোক নন। খুনে গুন্ডা তাঁকেও কাজে লাগাতে হয়। বললেন, ''ওটা ব্যাগে ভরুন। আপনার মতলবটা খোলসা করুন তো!''

''আমি স্যার প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি। আমার কোনো দল নেই। পৃথিবী থেকে কাউকে আপনার সরিয়ে দেওয়ার দরকার হলে আমাকে সুপারি দিন। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। একশো শতাংশ সাকসেস রেট। আমার নাম আজ পর্যন্ত পুলিশের খাতায় ওঠেনি।''

''এক চুমুকে পেগটা শেষ করলেন মুকুন্দ। ওঃ। পেটি মার্ডারার! তুমি কি ভেবেছ আমি তোমাকে রমলাকে খুনের সুপারি দেব?''

''আমি আপনাকে মারার সুপারি পেয়েছি স্যার। আমার রেটটা হাই। আড়াই লাখ অ্যাডভান্স দিয়েছে পার্টি।''

নিঃশব্দে খবরটা হজম করার চেষ্টা করলেন মুকুন্দ। বোতল থেকে একটা বড় পেগ আস্তে আস্তে ঢালতে লাগলেন গ্লাসে। দু-টুকরো বরফ নিলেন। ছোট্ট একটা সিপ নিলেন। লোকটা হাত থেকে বন্দুক নামায়নি।

''কত দিন আছ এই লাইনে?''

''আপনার মতোই। দশ বছর।''

''কন্ট্রাক্ট কত-র?''

''পাঁচ।''

''আমি ডাবল দিলে?''

''না স্যার, এক বার কারো অর্ডার নিলে বেইমানি করি না। আপনি একশো গুণ দিলেও না। এ ব্যাপারে আমার বিশেষ সুনাম আছে।''

লোকটির চোখে চোখ রাখেন মুকুন্দ। অদ্ভুত একটা শীতল ভাব গ্রাস করল মুকুন্দকে।

''তা হলে দেরি করছ কেন? কেউ এসে যেতে পারে।''

''না। এ-সময় আপনি দেখা করেন না সবাই জানে। আসলে আমি কাজটা সারার আগে সবাইকে জিজ্ঞেস করি তাদের কিছু বিশেষ ইচ্ছে আছে কি না।''

''ওঃ। একেবারে ট্রু প্রফেশনাল?''

কিছু উত্তর দিল না লোকটি।

''সবাই অ্যাকসেপ্ট করে?''

সব সময় যে সুযোগ পাই তা তো নয়। তবে বেশির ভাগ লোকই কিছু একটা বলে। এক বার এক জন বাইশ গ্লাস জল খেয়েছিল।

মুকুন্দ ভাবছিল সেন্টার টেবিলটা পায়ের ঝটকায় লোকটার গায়ে তুলতে পারবে কি না। পায়ের গ্রিপ ঠিক করার জন্য একটু শরীরটা এলিয়ে দিল গদিতে।

''তলার কাঠটা আমি চেপে রেখেছি স্যার। টেবিলটা উলটানোর চেষ্টা করে লাভ নেই।'' বন্দুকটা উঁচিয়ে রেখেই লোকটা বলল। ওর গলায় একটা আশ্চর্য বিনয়ের ভাব আছে। মুকুন্দ অবাক হয়ে ভাবল।

''আমি একটা উইল করতে চাই।'' মুকুন্দ বলল। ''এখন মরার ব্যাপারটা তো মাথায় ছিল না। ওটা করা হয়নি।''

''কিন্তু উকিল-টুকিল তো ডাকা যাবে না স্যার!''

''সে আর বলতে! আমি সাদা কাগজে লিখে যাব।''

''বেশ, তবে আমার সামনে লিখবেন এবং লেখা হলে আমি পড়ব। উইলের নাম করে তো অন্য কিছুও লিখতে পারেন!''

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মুকুন্দ। লোকটিও দাঁড়াল।

''ওই ড্রয়ারে কাগজ-কলম আছে।'' এক পাশের ছোট রাইটিং টেবিলটা দেখালেন।

''এক মিনিট স্যার। আমি একটু চেক করে নিই কোনো বন্দুক-টন্দুক আছে কি না। মরবে জানলে লোকে ভীষণ ডেসপারেট হয়ে পড়ে।''

ড্রয়ার সার্চ করে সরে দাঁড়ায় লোকটি। সুদৃশ্য কলমে দামি কাগজে উইল করে মুকুন্দ সেন্টার টেবিলে উইলটি রাখলেন। মুকুন্দর ওপর এক চোখ রেখে আর এক চোখে উইলটি পড়ে ফেলল লোকটি। বলল,

''এমনিতেই তো স্ত্রী হিসেবে উনিই আপনার সব সম্পত্তি পেতেন।''

এই কথাটার উত্তর দিলেন না মুকুন্দ। বললেন, ''উইলটা আমার দেওয়াল-লকারে

রাখতে হবে। এখানে থাকলে কেউ সরিয়ে দিতে পারে।”

“আপনার একটা বেরেটা পিস্তল আছে জানি। সেটা লকারে?”

ঘাড় নাড়লেন মুকুন্দ, “হ্যাঁ।”

“ঠিক আছে, খুলুন লকারটা। এক হাতে উইলটা রাখুন। আমি আপনার পিছনে আছি। কোনো চালাকি করবেন না।”

উইলটা লকারে রেখে লকার বন্ধ করে দিলেন মুকুন্দ। বললেন, “কে তোমাকে সুপারি দিয়েছে সেটা জানতে পারি?”

“লাভ?”

“জেনে যাওয়া। কৌতূহল বলতে পার।”

“তাতে তো শেষ মুহূর্তে দুঃখও পেতে পারেন।”

“এখন কি আর তার কোনো দাম আছে?”

লোকটি কয়েক মুহূর্ত অদ্ভুত চোখে মুকুন্দকে দেখল। বলল, “সত্যি বলতে স্যার, আপনাকে মারতে আমার খারাপই লাগছে। আর কাউকে এত ঠান্ডা মাথায় থাকতে এ-সময় আমি দেখিনি। আমার ইতিহাসেও খদ্দেরের নাম কাউকে বলিনি, তবে আপনি সবার থেকে আলাদা! সত্যিটা সহ্য করার ক্ষমতাও আছে। যার নামে আপনি উইল করলেন তিনিই— মানে আপনার স্ত্রী।”

সেন্টার টেবিলের ওপর থেকে হুইস্কির গ্লাস তুলে এক চুমুকে শেষ করে দিলেন মুকুন্দ। লোকটিকে বললেন,

“ওই লকারটার কম্বিনেশন লক খেয়াল করেছ?”

“হ্যাঁ।”

“ওর কম্বিনেশনটা একমাত্র আমিই জানি। আমার স্ত্রীও জানে না। যে পেনটা দিয়ে আমি উইলটা লিখলাম তাতে একটা মাইক্রো ক্যামেরা লাগানো আছে। অরিজিনাল সোনি। জাপানে কিনেছিলাম। ওটার ক্লিপটা খোলামাত্র তোমার ছবি ওই ক্যামেরায় উঠে গ্যাছে। হাতে বন্দুক সুদ্ধ। আমাকে গুলি তুমি করতে পার। কিন্তু এই প্রথম পুলিশ তোমার চমৎকার একটা ছবি পাবে।” লোকটির চোখে শ্যেনদৃষ্টিতে চোখ রাখলেন মুকুন্দ। ভাবলেশহীন চোখ। “কী? ঝুঁকিটা নেবে?”

“এখন আপনাকে ভয় দেখিয়ে তো লাভ নেই!”

“নাঃ। বাঁচতে হলে তোমাকে নম্বরটা আমার বলা চলে না।”

“মুশকিল হয়ে গেল।” হতাশ ভাবে বলল লোকটি। “আমার প্রথম ফেলিওর।”

“সবারই জীবনে একটা প্রথম বার আসে।” সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললেন মুকুন্দ। “এখন বন্দুকটা নামাও। আমরা বরং ঠান্ডা মাথায় একটু ব্যাপারটা দেখি। পেগ ঢালব?”

লোকটা পিস্তলটা কোমরে রেখে সোফায় বসল। বলল, “দিন”।

আর একটা গ্লাস নিয়ে এলেন মুকুন্দ। “বরফ দেব?”

ঘাড় নাড়ল লোকটি। গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে মুকুন্দ বললেন, “তোমার মতো লোক আমারও কাজে লাগে। হাওলার ব্যাবসা। বোঝোই তো। টাকাপয়সার লেনদেন। অনেক ঝামেলা। তোমার এই ছবিটা আমার কাছে আপাতত থাক। কোনো অসুবিধে নেই।”

“কিন্তু ছবিটা আপনার কাছে থাকলে তো স্যার আমার খুব সমস্যা।”

“না না, ও ছবি আমি তোমাকে ফেরত দিয়ে দেব। পেন সুদ্ধ। আমার গিফট হবে ওটা। তুমি খালি তোমার কাজটা কমপ্লিট করো।”

“তার মানে?” এই প্রথম লোকটিকে বেসামাল হতে দেখলেন মুকুন্দ পাটোয়ারি।

“আরে তুমি তো অ্যাডভান্স আড়াই লাখ পেয়েছ। এর পর তো আর আমার দাম্পত্য জীবন চলতে পারে না।”

“আপনাকে মারলে তো ছবিটা রয়ে যাবে।” হুইস্কিটা শেষ করল লোকটি।

“এত ক্ষণ তোমাকে বুদ্ধিমান ভাবছিলাম। আরে পাশার দানটা তো এখন আমার হাতে। বন্দুকটা এ-বার উলটো দিকে ঘোরাও। যাও। কাজটা সেরে এসো। তার পর তোমার ছবিটা নিয়ে যাও। তবে দুটো কথা।”

“কী স্যার?”

“এক, বাকি আড়াই লাখ তুমি পাবে না। খুনখারাপিতে আমি টাকা খরচ করি না। দুই, তুমি যদি আবার আমার মতো ওখানেও মহানুভবতার কেলেংকারি করো তো আর ফেল করো তবে সে দায় তোমার। ছবিটা তা হলে আমার কাছেই থাকবে। সুতরাং গিয়ে এ-বারের মতো গল্পবাজি জুড়ে দিয়ো না।”

ভরা গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন মুকুন্দ।

“কাজের পরে ফটোটা পাব তার গ্যারান্টি কী স্যার?”

“গ্যারান্টি?” অবাক হয়ে তাকালেন মুকুন্দ।

“হাওলা ব্যাবসায় বিশ্বাসটাই সব চেয়ে বড় বস্তু হে — কী যেন তোমার নাম, সেটাই তো বলোনি। যাক গে, আমার ব্যাবসায় লোককে কথা দিলে তার খেলাপ হয় না। তা হলে এই মুকুন্দ পাটোয়ারিকে কবে এই পাট চুকিয়ে দিতে হত!” ঘরের দেওয়াল ফাটিয়ে হেসে উঠলেন মুকুন্দ।

দরজা খুলে দিলেন সুপারিওলাকে।

“দ্বিতীয় আর একটা কারণ আছে। তোমার মতো লোকের সঙ্গে আমি শত্রুতা জিইয়ে রাখব না। এ-বার হয়তো ফসকে গেলে। পরের বার তো আর তুমি চান্স দেবে না কী বলো?”

হাসতে হাসতেই দরজা বন্ধ করলেন মুকুন্দ।

জবা বিশ্বাস

১৪১৭-র নববর্ষ ও একটি অনুভূতি

হঠাৎই ভোরের দিকে একটা চিৎকারে রমার ঘুমটা ভেঙে গেল। না, চিৎকার নয় তো, এটা তো উল্টোদিকের বাড়ির ছোটনের গলা মনে হচ্ছে।

কি হল! তবে কি ... কানটা খাড়া করে থাকে কিছুক্ষণ। সব চুপ। তাহলে হয়তো মনের ভুল এই ভেবে আবার পাশ ফেরে।

সকালে ঘুমটা ভাঙতেই মনে পড়ে আজ ১লা বৈশাখ। পাড়ায় ছ/সাত জন ব্যবসায়ী থাকাতে পয়লা বৈশাখের সকালটা বেশ ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আজ দোতলার বারান্দায় আসতেই একটু অন্যরকম লাগল।

শুভদের পাঁচিলের ধারে দু-তিনতজন নিচু স্বরে কথা বলছে। গোটা পাড়াটা থমথমে। একটা অজানা আশংকা ও বিষন্ন মন নিয়ে নিচে নামতেই খবরটা শুনল।

ছোটনের বাবা রঞ্জনবাবু মারা গেছেন। মন মানতে চায় না। জিগেস করল,'খবরটা কে দিল? ঠিক শুনেছ তো?'

রমার দেওর বলল, 'হ্যাঁ বৌদি, খবরটা সত্যি। কাল রাত তিনটের সময় খবর এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে রমা যেন চলে যায়, দশ বছর আগের এমনই এক সকালে, যেদিন ...

সমরেশও ছিল রঞ্জনবাবুর মতো খুব মিতভাষী। কিন্তু মুখে সবসময় একটা স্মিতভাব। প্রত্যেককে খুশি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা।

শুধু নিজের কষ্টটা সবার কাছ থেকে আড়াল করে। যেন কেউ জানতে বা বুঝতে না পারে।

সেদিন ছিল সমরেশের অফ্-ডে। বোনেরা আসবে তাই রমা অফিস থেকে একটু আগেই বাড়ি ফিরেছে।

বাড়ি ঢুকে দেখে গোটা বাড়িটা থমথমে। সমরেশ বুক চেপে ওর মার ফটোর দিকে তাকিয়ে আছে। অসহ্য যন্ত্রণা - বার দুয়েক বমি হয়েছে।

রমা দেরি না করে ডাক্তারকে ফোন করে।

ডাক্তারবাবু দেখে বললেন,'ম্যাসিভ অ্যাটাক। ইমিডিয়েটলি হসপিটালাইজড করতে।' ঠিক তিনদিন পরে ডাক্তারবাবুর মুখে হাসি। কন্ডিশন বেটার।

রমা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানায়। ভাগ্যিস ওরা সবাই ছিল। না হলে একা সে কী করত! কিন্তু তখনও সে জানত না ঈশ্বর আরও কত বড় পরীক্ষার পরিকল্পনা করে রেখেছেন।

সেদিন রাতে শুয়ে রমার ঘুম আসছিল না। কত হাজার রকমের ভাবনা।

সমরেশ ভালো হয়ে উঠলে এবার মেয়েটার বিয়ের ব্যাপারটা ভাবতে হবে। ভাবতে ভাবতে

কখন যেন চোখ ঘুমে বুঁজে এসেছিল।

সেই ঘুম ভাঙল বুকের মধ্যে এক অজানা ভয় আর কষ্টের ইঙ্গিত নিয়ে। হাসপাতালের ফোন।

তারপর তো আজকের মতোই থমথমে সকাল।

বাড়ির আশেপাশে লোকজনের আনাগোনা, নিচু স্বরে কথা, কান্না, সান্ত্বনা ... শুধু চোখে জল নেই রমার।

হঠাৎ তার যেন অনেক দায়িত্ব পড়েছে সকলের দেখাশোনা করার, সমরেশের অন্তিম যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পরার..

গতকালই রমা তার বন্ধুদের সঙ্গে বৈষ্ণোদেবী দর্শন করে দশ দিন পর বাড়ি ফিরেছে। হেঁটে যেতে পারায় , বৈষ্ণোদেবী থেকে দু কিলোমিটার উঁচুতে ভৈঁরোনাথ দর্শন করতে পারায় ভীষণ খুশি।

ফিরে এসে কতবার কতজনকে বলেছে ঠাকুর তার ইচ্ছা পূরণ করেছেন। কিন্তু আজ পুজোর ঘরে বসে সে ভাবছে, এ তোমার কেমন লীলা!

এটা তো দুদিন আগেও ঘটতে পারতো! তাহলে কি সমরেশকে সে ভুলতে বসেছিল! তাই কি ঠাকুর...

হঠাৎ রমার এক বান্ধবীর ফোন, 'পাসপোর্টে ছাপ ফেলবি নাকি? একটা কম পয়সার প্যাকেজ আছে।'

কি উত্তর দেবে বুঝতে পারে না। মনের মধ্যে একটা সুরই গুনগুন করে চলে

বেড়ায় —' কাজের মাঝে মাঝে, কান্না-হাসির দোলা তুমি থামতে দিলে না যে...'

বহুরূপীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা **'চৈতন্য'** — যদি না দেখে থাকেন,
দেরি করবেন না, দেখে ফেলুন।
ঘটনা ইতিহাস, প্রসঙ্গ সমসাময়িক।
চিন্তায় চৈতন্য হবে।

বিশাল ভদ্র

এবং ভুভুজেলা হাঃ হা

কাকে কান নিয়ে গেছে এমন ঘটনার কোনো প্রমান নেই। 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ'। বহু মানুষ বিশ্বাস করে। আমি করি না। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে আশেপাশে শোনার ফলে, একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনা। বিশ্বাস ব্যাপারটার গোকুলে বৃদ্ধি। বাড়তে বাড়তে অন্ধ। সোয়াইন ফ্লু।

মাটির উপরে — সামনা সামনি, তাকে ঘিরেই যত অবিশ্বাস। দুঃস্বপ্ন। গভীরে কাকচরিত্র। বেশ ক-একটা আজগুবি ঘটনার সঙ্গে নাম জড়িয়ে দেয়া। যেমন কাকের মাংস কাকে খায়। বেল পাকলে কাকের কি। পুরো জাতির অপমান। ভয়ংকর। সহজেই শহিদ জাত্যাভিমান — দেশভক্তি। রাজ্যের বর্জ্য খেয়ে জীবনানন্দ। অন্যের ব্যাপারে সাত তো দূরের কথা পাঁচেও নেই। কোনও পক্ষের পক্ষপাতীও নয়। পাখনা আছে, পাখির স্ট্যাটাস বা ওবিসিও নয়। মড়া, পচা, ফ্যালা খেয়ে খেয়ে রক্তহীন, পেটরোগা — চিকিৎসা উড়াল পুল, বায়ার্ণ মিউনিখ। জীবনভোর চিয়ার্স, —'আমি যামিনী তুমি শশি হে...'। বাইরে কিছু সমস্যা উঁকি দিলে, 'ম্যায় হুঁ না'!

বাজার থেকে কেনার সময় প্রত্যেক মানুষ নিখুঁত, সব যাচাই করে। বিশ্বাস করার সময় করে না। মুখে যত বলি আমি একজন সত্যান্বেষী বাংলায় ফ্যাক্টস ফাইন্ডার। তা কিন্তু নয়। আসল আকর্ষন বুঝলে নটবর, কে বা কারা দিচ্ছে। কী উদ্দেশ্য। কাকে কান নিলে কার বা কাদের সুবিধা? প্রশ্নর প্রদক্ষিন। অংকের নিয়মে নতুন আলাপের খোঁজখবর নেবার সময় ফেলু মিত্তির। গ্রাস হবে। পূর্ণ হলে খুবই ভাল। অর্ধেকেও ঠিক আছে। চিড়তো ধরবে। একটা বিশ্বাস অন্য বিশ্বাসে ফাটল ধরায়। যেকোনও বয়সেই পোলিও নেওয়া প্রয়োজন।

এখনো লিখতে গেলে অব্দটা ভুল হয়ে যায়। কোট আনকোট আয়াতালার দুনিয়ায় আজও এতো কাফের! লম্বায় তিন ফুট। চওড়ায় তিনফুট। এক্কেবারে গোল। অপরিচিত কথ্যভাষা। নীল কুমীর। একদল অন্যদলের মগজ খেয়ে বেঁচে থাকে। ঝোপ বুঝে কোপ মারলে, ত্রিশ শতাংশ ছাড়। 'যব প্যার কিয়া তো ডরনা কেয়া' ...'

যারা আঙুল তোলে, বিশ্বাস করে, আনন্দ পায়, কাকে কান নিয়ে গেছে। আসা-যাওয়ার পথে কানে এলে, কে বলছে সেদিকে না দেখে, আকাশের দিকে, গাছের ডালে ইত্যাদি অসম্ভাব্য কিছু জায়গা তাকিয়ে দেখে। পায় না। তখন মনের মাধুরী মিশিয়ে বলে নিজের কানে শুনেছে। অমুকে বলছিল। অমুক কি তুলসি পাতা! বাড়াভাতে ছাই পড়লে কুৎসা। অভিযোগের পিছনে আফশোষ। আঙুল কামড়ানো। চিন্তা-ভাবনায় সংরক্ষিত অঞ্চল। 'সাবধান হও পারমিতা। ইতিহাস সেঁকে নেবে রুটি।'

একবার একটা নাটক দেখেছিলাম। একজন লোক স্টেজ জুড়ে পোস্টার লাগাচ্ছে। প্রতি দশমিনিট অন্তর অন্ধকার। এক মিনিটের জন্য। আলো জ্বললে, একটাও পোস্টার নেই। এবার দুজন মিলে পোস্টার লাগাচ্ছে। আবার অন্ধকার। আবার আলো এলে একাটাও নেই। এবার তিনজন মিলে পোস্টার লাগাচ্ছে। অন্ধকার। আলো জ্বললে একই দৃশ্য। এবার এলো চারজন। আলো জ্বলছে নিভছে। পোস্টার উধাও। আর তা লাগাবার জন্য লোক বাড়ছে। একসময় স্টেজ ভর্তি লোক। সবাই

পোস্টার লাগাতে চায়। আলো আর নিভল না। কারণ অন্ধকার করে দেবার লোক আর পাওয়া গেল না। আবহে অন্ধকারের সময় 'মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন।'

চর্বিত চর্বন ব্রেকিং নিউজ। আইপিএল নিয়ে সেনা প্রধানের হুমকি। মাই নেম ইজ খান প্রিমিয়ারে ভাঙচুর। পিক এন্ চুজ। সারাদিলে খাবার। চলল তো চলল। ভীষণ বাজে লাগে। আমজনতা মিথেন গ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার পথে। কারো গায়ে ফোস্কা পড়ে না। যাদের পড়ে — দলদাস? 'বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে খেলে বিপদের সম্ভাবনা নেই।'

পুরোনকালের গোঁড়া সমাজপতিরাও হার মানবে। কু-সংস্কার বাঁচাতে নিরলস কীটনাশক স্প্রে। তবু যদি দেয়ালে পিঠ ঠেকে, ইতিহাস। শাস্ত্র নাকি? রক্তের গ্রুপ যাই হোক মূল কথা ভক্তি। আপগ্রেড হবে কোথা থেকে। ঘাড়গালাপেট সমান। বড় বড় হোর্ডিং, কাট আউট— যার মায়ের বড় গলা।

সুকুমারদা বলতেন, 'সত্যি বলতে ঘাবরাস না। অনেকেই ছেড়ে চলে যাবে। সেটা মঙ্গল। অন্তত একটা মিথ্যে নিয়ে নিজেকে ভুলে থাকবি না।' ঘটনা। ঘটনা দেখা এবং শোনার মধ্যে চিনের প্রাচীর। কারণ জানতে চাইলে, চেহারা সিকিউরিটি সার্ভিস। সমস্ত লজিক হুইল চেয়ারে। 'মা-বাবাকে বলছি শোন, লিঙ্গ জানতে চেও না কোনো...।'

নাম খুঁজছিলাম। খুঁজতে...খুঁজতে...খুঁজতে...খুঁজতে... মগজে লাভাস্রোত। সমস্যা নামটাকে কী নামে ডাকব? যদি কারো সঙ্গে মিলে যায়। যদি কেউ নামটাকে নিজের সম্পত্তি মনে করে। সম্ভাবনা আছে। মানুষের থেকে নামের সংখ্যা কম। কবিতা/গল্পে নামের মিল হলে কুরুক্ষেত্র। যার নাম তার-ই থাকে। তবু গেল গেল মোমবাতি। ধর্ম বাঁচাতে। দল বাঁচাতে. . ধনে পাতা ফোড়ন দিয়ে চিলি শার্ক। নিঙড়ে, কচলে, চটকে, পিষে তেতো। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটা রক্তাক্ত তারিখ চাই। 'মাত্র ছ থেকে সাত মিনিট। তারপর হেঁটে বাড়ি যান।'

সময় থাকে না। নাম থাকে না। প্রিয় মানুষটাও থাকে না। কষ্ট—বিচ্ছেদ, অনাহারে ফুলেফেঁপে শুকিয়ে —পরিবর্তনের জ্ঞানেশ্বরী। কোনো ক্রীম কাজ করে না। শুধু বীজ মন্ত্র। অঙ্কুরিত হবার জন্য যার কোনো জন্মভূমি নেই। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' মানি প্ল্যান্ট।

একদল আসে, একদল চলে যায়। প্রথমেই সন্দেহ-খই ছড়িয়ে বরণ। সারাজীবন ব্যঞ্জনবর্ণ হয়ে থাকো। স্বরবর্ণের অধিকারে হাত বাড়ালে, আমি কি তোমার পর? প্রিয়জনের খোঁজ। উড়ানের আকাশও বন্ধনীর মধ্যে। কেউ বোঝে না, সব ভালবাসাই সিস্টেম থেকে ডি-রেলড। অথবা রিভার্স সুইং। 'ভ্রমর সেথা হয় বিবাগী..'.

একটার পর একটা ফতোয়া, অনার কিলিং। নতুনরা জানতেও পারে না মিষ্টি মিষ্টি হাসি আসলে গ্রে-ম্যাটার বন্ধ্যাত্বকরণের টীকা। সব সম্পর্ক শুন্যের গুণিতকে গভীরতর অথবা তম। আন্তরিকতার সামনে মেটাল-ডিটেকটর। দায় ক্রমশ বদ্ধ — ফস্কা গেরো। মনুষ্যেতর সঙ অভিধানে, দৃঢ় মানে ঢিলে। গণতন্ত্রের দরজায় প্রবেশ অবাধ (কন্ডিশন অ্যাপ্লায়েড)।

কাকে কান নিয়ে গেছে এমন সব মানুষের উপযুক্ত ক্ষতিরপূরণের দাবিতে এবার অনির্দিষ্ট কালের বাংলা বনধ্। এবং ভুভুজেলা হাঃ হা...

‘আমার সকল যাওয়া সেই না-যাওয়ার ভারে
আজীবন ফেরা হয়ে ওঠে।’

‘আশারফ আর আতরাফ হিন্দু-মুসলমান
দ্বন্দ্ব না হত তবে থাকত না
বাঁকাপথরেখা।’

‘যাওয়া-না-যাওয়ার মাঝখানে,
একটি অচল সেতু কারাগার হয়ে ওঠে ক্রমে।’

‘এই যে, রাখহরি।
মাত্র এইটুকুন জীবন নিয়ে
কী করি বল?’

‘সম্রাটের মত ছদ্মবেশে
ধুলোগায়ে দিনান্তের পথে
কোথায় লুকিয়ে আছো
ও হৃদয়,
হাতে নিয়ে রিক্ত একতারা।’

‘কথা বলতে অনভ্যস্ত জিহ্বা থেকে
শুধু গোঙানি বেরোয়
অসহায় আমি হঠাৎই বুঝতে পারি
কত বোবা আমার এই কথোপকথন।’

‘লোকে বলে, এই নিশিডাক, চরিত্রহীনের
এই শিসে ঝড় ওঠে, মেয়েদের গোপন বদ্বীপে
শ্লেষের আরকে ভেজা, তীক্ষ্ন এই নৈশ শিস শুনে
নিম্নরাজনীতি ভাবে, এই শিস বিভ্রান্ত কবির’

ক্রোড়পত্র — ‘কবিতা কবিতা (উত্তর পূর্ব)’

সাধারণ ভাবে ক্রোড়পত্রর যে বিস্তৃতি থাকে এখানে পাঠক তার একটা চুমুক পাবেন আকণ্ঠ তৃপ্তি পাবেন না। উত্তরপূর্বের কবিদের কবিতা নিয়ে আগেও কাজ হয়েছে। এটা তার অনুসরণ নয়। সুতরাং প্রতিনিধিত্বর সম্পূর্ণতা খোঁজাখুঁজি করলে হতাশ হতে হবে। এই মুহূর্তে সেখানে সমকালীন বাঙালি কবিদের কবিতা চর্চার একটা স্কেচ দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। আরো অনেকের কবিতা থাকার হয়ত প্রয়োজন ছিল — নেই। সংখ্যাল্পতা এখানে বিশেষ ভাবনা — অসম্পূর্ণতা নয়।প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তার পরিচয় আমরা পাব। এই সংখ্যার জন্য যাঁর চেষ্টা এবং সহযোগিতা আপ্রাণ , সেই কবি, যশোধরা রায়চৌধুরীর কৃতিত্বের কোনো ভাগীদার নেই। তাঁকে পত্রিকার পক্ষ থেকে আন্তরিক ভালবাসা। — সম্পাদক। কানাকড়ি।

কানাকড়ি

কবি :-

দিলীপকান্তি লস্কর
শঙ্করজ্যোতি দেব
অভিজিৎ চক্রবর্তী
অমিতাভ দেব চৌধুরী
সঞ্জয় চক্রবর্তী
বিকাশ সরকার
স্বর্ণালি বিশ্বাস ভট্টাচার্য
অনিতা দাস ট্যান্ডন
প্রবুদ্ধসুন্দর কর

প্রবন্ধ :-

যশোধরা রায়চৌধুরী -

দিলীপকান্তি লস্কর

লোকটা

লোকটা অরণ্য কাটে, দেহ যেন অরণ্যের বৃক্ষ ও শিকড়
জোঁকমশাশীতগ্রীষ্মে প্রতিক্রিয়াহীন
তার সহনশীল বল্কলসদৃশ উদোম ত্বকের ওপর
কোনো নগ্নতার ছায়া নেই, তবু লজ্জাঙ্গে একখণ্ড কৌপিন।
কাটে বৃক্ষ কুঠারের প্রচণ্ড আঘাতে
অরণ্যের মৌনতা ভেঙ্গে খানখান করে ফেটে পড়ে
যেন তার ক্ষোভক্রোধঘাম
কিন্তু কার বিরুদ্ধে সে জানে না।
তার জুতো না-পরা পায়ের নিচের ত্বক পুরু হতে হতে
ঠিক একজোড়া রূপান্তরিত জুতো
নখগুলো বাঘনখ প্রায়; নিতান্ত প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ছাড়া
যার ব্যবহার সে জানে না
চাঁদের আলোয় তাকে দেখে এলাম লঙগাই নদীতে
নায়ের গলুই ধরে বসেবসে ভাটিয়ালী গায়।

কবিতায় বক্তব্যধর্মীতা

এবার তোমাকে আমি পরাই বিদ্যুৎ
ঝলমল করে ওঠো তুমি
ফলত এখন আমি হাবুডুবু খাই
জাপ্টে লেপ্টে ধরে করি সোহাগ চুম্বন

কথাবলি সুড়সুড়ি দিই
তুমি নেচে ওঠো, সুন্দিজালি বেতের মতন
হাসো মুচকি হাসি
আনন্দে আশ্লেষে রেখে আহ্লাদে শুধাই
— ওগো, কী নাম তোমার?

আমাকে অবাক করে ছুটে গিয়ে
বালিশেই মাথাগুঁজে কাঁদো
কি আশ্চর্য নিঃশব্দে নীরবে!
তারপর সারারাত অশ্রু আর রূপের কনকন
আমাকেও করেছে নির্বাক!

এতো সূত্র এতো মন্ত্র এতো আয়োজন
ব্যর্থ হয়ে যায়; তোমাকে নির্বাক দেখে
ম্লান হয়ে যায় প্রেম, মন ও মনন!

শঙ্করজ্যোতি দেব

মহাপ্রস্থান

খুব নিঃশব্দে ঈশ্বরের প্রস্থান হল

হা-করা মুখে শেষবারের মতো
দিলাম একটু মায়া

তার বংশে বাতি দেবার মতো কেউ
আর নেই

মুক্ত বাতাসের চাদর তাকে ঢেকে দিল

শরতের সোনা রোদ
হঠাৎ গান গাইতে লাগল

জিজ্ঞেস করে জানা গেল
সে গান দুঃখের নয়, আনন্দের।

শঙ্করজ্যোতি দেব

সোনাপুর, ২০০১

মেঘের পাহাড়ে পথের প্রহারে সরল কাদার শোক
বয়ে গেল রাতের ছড়ায় — একটি যুবক
ভাসতে ভাসতে গিয়েছিল চলে সুরমার কোলে
সুনামগঞ্জে।

আশারফ আর আতরাফ হিন্দু-মুসলমান
দ্বন্দ্ব না হত তবে থাকত না
বাঁকাপথরেখা।

পথের আড়ালে কত কূটচাল
বয়ে যায় এই ছদ্মপ্রবাসে
প্রবঞ্চিত ভারতবর্ষে।

বলো যাই চলো, চলো যাই বলো নদীর ওপারে চলো
কূটচাল ব্যোমচাল হয়ে যাক সরল চোখের আলো।

আমি ও অনন্ত - ৩

সাইকেলের ক্যারিয়ারে খবর-কাগজ নিয়ে
দুপুরে অনন্ত গ্রামে এসে ঢোকে
রাবারের টিউবে বাঁধা অন্নপূর্ণা যোজনা,
বার্ধক্য ও প্রসবকালীন ভাতা
প্রধানমন্ত্রীর পাগড়ি ও রাষ্ট্রপতির লম্বা চুল
গিট খুললে দেখা যায় ফাঁকা
একবর্ণ সুসংবাদ নেই তাতে।

আসলে বাঁশের সাঁকোটা পার হতেই
এই ইন্দ্রজাল ঘটে যায়
সমস্ত সংবাদ ঢুকে যায় সেরাপের বোতলে
অদৃশ্য হয় পাদ্রির জোব্বার নীচে
অথবা অম্বাগাঁওয়ের হাটে —
আধা কাটা শুয়োরের চর্বির ভাঁজে
কিছু ডুবে যায় কুলসীর জলে

সন্ধ্যায় অনন্ত ও আমি
সেইসব চোষক কাগজ
দিয়ে আসি মেয়েদের বাড়িতে বাড়িতে

আমি ও অনন্ত - ৮

তাজা ক্ষত নিয়ে এক সন্ধ্যায় অনন্তের দুয়ারে এসে দাঁড়াই
হয়ত ভেঙে পড়ব বুঝে সে হাত রাখে পিঠে
স্পর্শে ঝরে পড়ি আমি, ঝরে পড়ে বিষ রক্ত, নষ্ট স্বপ্নের পুঁজ

সে রাতে অনন্ত আমাকে চায়না দিদিমণির কথা বলে
জানায়, অঙ্কের খাতায় তার অকৃতকার্যতার ২৯কে
কীভাবে টেনেটুনে একত্রিশ করে দিয়েছিলেন তিনি
জানায়, তার জীবনের না মেলা সব অঙ্কের পাশে
আজীবন চায়না দিদিমণির কেমন অনায়াস ছিলেন

বসেই আছি অঙ্ক খাতা খুলে
শূন্য ক্লাসরুম।

অভিজিৎ চক্রবর্তীর কবিতা

আমি ও অনন্ত - ৯

গ্রামে গ্রামে সরকারি নপুংসতা বিলি করার কাজ
বাঁশের সাঁকো থেকে ঝুঁকে ভাসিয়ে দিলাম জলে
ভেসে যাকজন্ম নিরোধক যত বড়ি আর বেলুনের স্তুপ
এখানে জীবন্ত খুব জাতকের অকাল মরণ

এক আঁতুড় গাছ কোমরে গুঁজে অন্য এক আঁতুড়-আঁধারে
অতএব ঢুকে যান নবম গর্ভিনী ...
দুটো তার ম্যালেরিয়া নেবে, দুটো যাবে প্লাবন উত্তর প্লেগে
টিকা কেন্দ্র দুর্গম যত, অনাহার তত অনায়াস

সাঁকো থেকে নেমে আসি বিধুর হৃদয়
এপারে অনন্ত একা, নিমগ্ন 'বিয়ানাম' গায়

অমিতাভ দেব চৌধুরীর কবিতা

কেন লিখি

পাথরের ভাষা লিখি
জলের লিখনে।
যদি কোনোদিন
পাথরের বুকে
ফুটে ওঠে একটি লাজুক
কুঁড়ির আভাস।
এই সাধ, টের পাই,
জলের গহনে।

বাসি কথা

শান্ত কোলাহলগুলি সরিয়ে রেখেছি সবিনয়ে
খুঁজেছি ব্যস্ত নীরবতা।

একদিন এ জীবনে উঠবে রোদ্দুর
লেপ, পাণ্ডুলিপি সব ঝেড়েঝুড়ে শুকোব উঠোনে —
ইচ্ছে এই ছিল মেঘে-ঢাকা।

মাঝে মাঝে খুলেছি তোরঙ্গ
তার ওপর দিয়ে বহে গেছে কত ইঁদুরের রাত
গন্ধটুকু রয়ে গেছে, এই জামা-কাপড়-হৃদয়ে।

ইঁদুরের এঁটো সব অক্ষরমালা
গোপনে সাজাই একা একা
যা লিখেছি এতদিন, সবই বাসি কথা।

একদিন এ জীবন রৌদ্রের আহার হবে —
ইচ্ছে এই আছে মেঘে-ঢাকা।

অমিতাভ দেব চৌধুরীর কবিতা

বরাকভ্যালি এক্সপ্রেস

যে ট্রেন যায়নি কোনোদিন, আমি তার যাত্রী ছিলাম।

বিদায় চুম্বনগুলি, দেশের ভিটের বাস্তুসাপটির মতো
কিংবদন্তীজন্ম ফিরে পেল।
অবাক অপেক্ষাগুলি খুর ঠুকে ঠুকে রাজপথে নামাল গোধুলি।

তারপর কত ট্রেন গেল, এল। কত কত কামরার ঘুম
বাক্যহারা স্টেশন ফুরোল।
তবু সেই না-যাওয়ার স্বপ্নভ্রষ্ট ছায়া, পরবর্তী প্রতিটি যাওয়ায়,
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল যে কেবল।

আমার সকল যাওয়া সেই না-যাওয়ার ভারে
আজীবন ফেরা হয়ে ওঠে।
আমাদের সব থাকা সেই না-যাওয়ার ভারে
সড়কের পাশে, সস্তা হোটেল খোঁজে
পরিত্রাণ, মূল স্রোত, ললাটলিখন।

যাওয়া-না-যাওয়ার মাঝখানে,
একটি অচল সেতু কারাগার হয়ে ওঠে ক্রমে।

যে ট্রেন যাবে না কোনোদিন, আমরা তার যাত্রী ছিলাম

সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতা

খেয়ালগাঁথা

১. যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ লড়াই
যেখানে ভালবাসা
সেখানেই হৃদয়ের ঠেক

২. মেঘ
নিজেকে উজাড় করে
অন্নদান করে
সকল প্রাণে।

৩. শিথিল যদি হয় করবী তোমার চুলে
অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবে এই শহরে।

৪. তোর কাজল কেন চুরি করে রাত,
সে কি আরো ঘন কালো হবে বলে।
রাত্রির অবাধ্য পাত্রে তাহলে
জমে উঠুক দু'এক পাত্র ঘনবরষার।

৫. বিষ খেতে খেতে দ্যাখো আমি কেমন
বিষমেঘে টইটুম্বর
তাহলে তোর বাড়া ভাতে কী দেব শ্যাম,
একবাটি আন্ধার, দু'হাতা মরণের ঘুঙুর।

৬. শব্দমুখরতা থেকে ছুটি নিয়ে
নৈঃশব্দের দিকে দেব পাড়ি, একদিন।
যাব, একান্ত নদীটির কাছে,
অনেক না-বলা কথা
তাকে বলার আছে।

সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতা

খেয়ালগাঁথা

৭. এই যে, রাখহরি।
মাত্র এইটুকুন জীবন নিয়ে
কী করি বল?

কোথায় যে শুরু হল
কোথায় যে তার শেষ
এই জটিল হিসেবনিকেশ কষার
কোনো নির্ভুল গাণিতিক ফিতে
আছে কি কোথাও!

তাহলে মনপবনের নাও-টাকে
ভাসিয়েই দি' প্রিয় নদে
ইচ্ছেমতো ভেসে যাক সে ...।

আমার জন্য থাকুক শুধু ভাটিয়ালি।

৮. কী নিয়ে গর্বিত তুমি, সামান্য প্রাণ!
মাটির ভাণ্ড এই যে নিপুণ করেছ
এক মুহূর্তে হয়ে যাবে খালাস

সমৃদ্ধ মৃত্যু নিকটেই আছে।

৯. কেরচনা করে আয়ুস্কাল
নিরন্তর বয়ে যাওয়া জল!
শ্মশানভূমিতে এই যে রেখে এলাম এক দূরন্ত জীবন,
তার না-বলা কথা শুনতে পেরেছি কি, আকাশ?

১০. কী রেখে যাব শেষে?

শুধু

ছাই।

বিকাশ সরকার-এর কবিতা

চিরভক্ত

পাখিরাই ভালো জানে রবীন্দ্রসংগীত; তত বেশি তত্ত্বকথা নেই
হারমোনিয়ামও তারা জানে না বাজাতে! আতাগাছে বসে
পাখি শুধু ঠোঁট ফাঁক করে লাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতে থাকে একা
ঠোঁটের ফাঁকের লাল আসলে হৃৎপিণ্ডেরই রং
এটা সখি বুঝে নিতে হবে। পাখিরাই বোঝে, তাই গায়...
কী নাম সে পাখিটির? কাঠঠোকরা কি? বুলবুলি? ফিঙে?
ও-পাখি কি তবে জর্জ বিশ্বাস? নাকি 'চারুলতা'র কিশোরকুমার?
এসব শোনে না পাখি, নামে ও সুনামে ওই চিরভক্তের
কী-বা আসে যায়! আতার পাতার হাওয়ায় তার ডানা কাঁপে
রোম খাড়া হয়, পাখি শুধু একা-একা প্রাণগান গায়
রবীন্দ্রসংগীত গাইতে অনেকেই শেষমেষ পাখি হয়ে যায়

স্বীকারোক্তি

কিরিচের মতো গানগুলি ঝুঁকে আসে কাছে
যেন গান তাকে কোনোদিন ভালোবাসেনি
যদি কাঁদো, চোখ থেকে তোমার রক্ত চুঁয়ে পড়ে
বুকের উপর চেপে আছে শৈশবের মাঠ
প্রেমিকাকে বাজিয়ে চলেছে এক ভুতুড়ে বেহালা

হায়, কতই পাল্টে গেল জীবনযাপন
মনে হয় আমি এক ভুলভাল জাদুগান
আমাকে ভুলে গেছে প্রিয় সব পাখি
ভুলে গেছে চিঠিগুলি, সাদা প্যাড, শাণিত পারকার

আসলে এমন জীবনযাপনই আমার প্রাপ্য ছিল
আমি শুধু চেয়েছিলাম সম্পূর্ণ প্রেম আর অল্প রমণী

বীজকল্প

১.
এখনও গভীর পেতে
আমার রয়েছে বাকি
এখনও ছায়ার মায়া
খর দ্বিপ্রহরে
তোমার শিকড় ছুঁতে
এখনও অনেক দেরী
আমার উদ্ভিদ

২.
আমাকে খনন কর
শিলা ভাঙো
দ্রবীভূত কর
প্রোথিত শিকড় দিয়ে
টেনে আনো
খনিজ লবণ
আমিও সহজ মাটি
হয়ে যেতে চাই
সেখানে তোমার
বীজ স্বনির্ভর
বৃক্ষ সম্ভব।

৩.
জানি বাতাসের কাছে
এ সংবাদ গোপন
রবে না —
যখন গর্ভিনী মাটি
কুয়াশার ঘসা কাঁচ ভোরে,
প্রথম কর্ষণ শেষে
শুয়ে আছে দিগন্ত অবধি,
ভীরু বীজ বোনা হলে
বাতাসে খবর রটে যাবে —
পোয়াতি জ্যোৎস্নার মাঠে
নবান্নের ভাত রাঁধা হবে।

৪.
আমানির পাত্রটুকু
ভরা থাক
সহজ ক্ষমায়
তোমার কাণ্ড, শাখা
পল্লবিত
ঘন বরষায়
আমার মৃত্তিকা ভিজে
স্নিগ্ধ হয়
সুজলা সুফলা
একটি বৃক্ষের জন্ম
সুনিশ্চিত তবে
এই বেলা।

দুঃখ

এই দুঃখ ছুঁয়ে দাও
দেখো দুঃখ আর একা নয়
তোমার স্পর্শ মেখে
সে আজ সুখের চেয়ে দামী।
ক্ষতে হাত রেখে দেখো
গভীরে বেহাগ ওঠে বেজে
শোণিতে শ্রাবণধারা
দুঃখ নাচে হৃদয়ের মাঝে।

হৃদয় তোমার দ্বারে

এখনও হয়নি দেখা
এশহর
কানাগলি, অন্ধগলি
বোবাগলি পথ হেঁটে হেঁটে
কখন পৌঁছাব আমি
ও হৃদয় তোমার দুয়ারে!
তার আগেতো এ শরীর
বিদ্রোহীর মত পথ আগলে
দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আত্মগোপনকারী
সম্রাটের মত ছদ্মবেশে
ধুলোগায়ে দিনান্তের পথে
কোথায় লুকিয়ে আছো
ও হৃদয়,
হাতে নিয়ে রিক্ত একতারা।

অনিতা দাস ট্যান্ডন-এর কবিতা

বোবা ভাষা

অজস্র নীরবতা দুই হাত মেলে যখন
একটু আওয়াজ ভিক্ষা করে আমার কাছে,
নিজের সাথে অনর্গল কথা-বলে-থাকা
আমি কেঁপে কেঁপে যাই
থমকে পড়ে ভিতরের অনুরণন
চারিদিকে নেমে আসে এক স্তব্ধতা
কী একটা বলার চেষ্টা করি
কিন্তু সেই ভাষা অনেক পুরোনো
কেউ বুঝতে পারে না...

কথা বলতে অনভ্যস্ত জিহ্বা থেকে
শুধু গোঙানি বেরোয়
অসহায় আমি হঠাৎই বুঝতে পারি
কত বোবা আমার এই কথোপকথন।

আর-পার

উঠান পেরিয়ে গেছে রোদ্দুর। ছায়া শুধুই দীর্ঘ
হয়। তাই দেখে ঘুরে আসছে ভয়ার্ত পাখি সব।
সূর্যের হননে ত্রস্ত চাঁদ মেঘের পেছনে। অন্ধকার
বাড়ছেই। বাতাসের শব্দে কেঁপে যায়
হ্যারিকেনের আলো। দূরে কোথাও পাশ পাল্টায়
একটা দীর্ঘশ্বাস। অ-নে-ক, অ-নে-ক পেছনে।
সেসবই ফেলে এসেছি সীমার ওপারে। এপারে
শুধুই শীত... প্রচণ্ড শীত

প্রবুদ্ধসুন্দর কর

নৈশ শিস

লোকে বলে, এই নিশিডাক, চরিত্রহীনের
এই শিসে ঝড় ওঠে, মেয়েদের গোপন বদ্বীপে
শ্লেষের আরকে ভেজা, তীক্ষ্ন এই নৈশ শিস শুনে
নিম্নরাজনীতি ভাবে, এই শিস বিভ্রান্ত কবির
সাড়া দিলে সংসদীয় ছানাপোনা বখে যেতে পারে
সঙঘারাম ধরে নেয়, কামার্ত ফুঙ্গির এই শিস
অষ্টাঙ্গিক ছিদ্র করে ফাল হয়ে বেরোবে নির্ঘাৎ
এই শিসে কেঁপে ওঠে মধ্যবিত্ত বিবাহকয়েদ
শিথিল কবিরা বলে, এই শিস গিমিকপ্রবণ
অপহৃত পাঠকেরা শুধু, শিসের ফুলকি থেকে
নিঃসৃত আলোয়, তার এই আটচল্লিশ পৃষ্ঠার
স্বশাসিত জঙ্গলের অন্ধকার ফাঁড়িপথে হাঁটে
সাপলুডোছক থেকে হেরাক্লিতাসের বাঁক ঘুরে
বিনামুক্তিপণে আজ, বাড়ি ফেরে যেসব পাঠক
তারা জানে, নৈশ শিস নিরস্ত্রপ্রণীত, প্রায়ই যাকে
সুবেবাংলাকলোনির ছায়াচ্ছন্নপথে, বেপরোয়া
কলার উঁচিয়ে, শিস দিতে দিতে যেতে দেখা যায়

যশোধরা রায় চৌধুরী

উত্তরপূর্বের বাংলা কবিতা

১ প্রথম পর্ব : উত্তরপূর্বের সমস্যার রোগলক্ষণ

উত্তরপূর্ব ভারতের বহিঃবলয়কে নিরঙ্কুশ বলেছিলেন তপোধীর ভট্টাচার্য। বলেছিলেন, 'সমাজ বিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসবেত্তার কাছে এই অঞ্চল যেন জীবন্ত গবেষণাগার।' যদুবংশের পুরাণকথাকে এখানে পুনর্নবীকৃত হতে দেখেছিলেন তিনি। 'স্বাতন্ত্রের অভিজ্ঞান সম্পর্কে অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা জাতিবৈরী অর্থাৎ অন্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তিক্ততা ও অসহিষ্ণুতার উৎস হতে পারে।'

আর অমিতাভ দেবচৌধুরী তাঁর এক লেখায় লিখেছিলেন, 'বাস্তবতা ও ভূগোল আমাদের অরণ্যভূধরবেষ্টিত। এই অরণ্যাচ্ছাদিত ভূগোল আমরা যখন ধ্যানে আর কল্পনায়, শ্রমে আর নির্মাণে গড়ে তুলি আমাদের কাব্যলক্ষ্মীর অবয়ব, তখন তার অধরের গোপন হাসিটিতেও জেগে থাকে এক উপজাতীয় কিংবা অসমিয়া কিংবা মণিপুরি হাসি। ঠিক এখানটাতেই আমরা বাঙালি হয়েও মূলস্রোতের বাঙালি থেকে আলাদা।'

ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের 'উত্তরপুব পুবের উত্তর মায়া পাহাড় আছে / নিত্য ফলে সোনার ফল সত্যি হীরের গাছে' কবিতাংশ উদ্ধৃত করে অমিতাভ বলেছিলেন, এ কি এই কামাখ্যা পাহাড়ের উপাখ্যানের মিলেমিশে যাওয়া এক ভূগোল? বল্মীকগাথায় ওই কবিই বলেন, 'এই উত্তরাধিকার সবিনয়ে উৎসর্গ করি তোমায়, কীটশ্রেষ্ঠ উই।... ১৯৪৭ অগণন বৃক্ষকে পথিক করেছিল।... ভুল আর অশ্রুর একটি সিন্দুক, যার চাবি হারিয়ে গেছে — এরই নাম জীবন। ... নতুন কান্নায় পুরনোর ভার লাঘব হয় না।'

ভুলে গেলে চলবে না এই গোটা গল্পটার শুরুই ১৯৪৭। দেশ ভাগের আগে কোন সীমান্তের কাঁটাতার নরম সবুজ বাংলার বুকের উপরে চেপে বসেনি। রক্তক্ষরণের অবিরত ইতিহাসের সাথেই জড়িয়ে আছে উত্তর পূর্বের কবিতা। ইতিহাসের নির্মমতাই সংজ্ঞায়িত করে মৈমনসিংহ, সিলেট অথবা হবিগঞ্জ-এর উদ্বাস্তুর মননকে, বাংলা থেকে অসমের কাছাড়ে, হায়লাকান্দিতে, করিমগঞ্জে অথবা তদানীন্তন শিলং-এ বাসা বাঁধা বাঙালি মননকে, সাইকি-কে। শিলং আর এক উদ্বাস্তুতা দেখেছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে ৭০-৮০র দশকে যে বাঙ্গালি চলে গেছে শিলচরে, বা বাসা বেধেছে গৌহাটিতে।

যেন সীমান্তের অবসেসন পিছু ছাড়ে না উত্তরপুবের। 'আর কটি সীমান্ত পেরোলে তবে আমরা ঘরে ফিরব? অথবা, 'উদ্বাস্তুকে আরো একবার উদ্বাস্তু হতে হয়। এই লাইনগুলি লেখেন দেবীপ্রসাদ সিংহ তাঁর গল্প 'হেই জুড'-এ, যেখানে, বাংলাদেশি রিকশাচালক রজব আলি ও শ্রীহট্টের শিক্ষিত যুবক অনন্ত দত্ত একই বম্ব ব্লাস্টে মারা যায়, একজনের ধড় অন্যজনের মাথার সাথে জুড়ে যায় কোন এক অজ্ঞাত আইডেন্টিফিকেশনে। এবং সেই প্রসঙ্গে লেখক আনেন থিও অ্যানজেলোপাউলোস নামক

গ্রিক পরিচালকের ছবির প্রসঙ্গে, যা সীমান্ত নিয়ে আবসেসড।

আবেগে, ভালোবাসায়, নিজেদের জাতিসত্তাকে চিহ্নিত করতে করতে বারে বারেই উত্তরপুবের কবিরা, দেখি, জড়িয়ে যান এক স্ববিরোধিতায়। একইসাথে তাঁদের বাঙালি সত্তার উদযাপন, অন্য দিকে তাঁদের মূল ভূখণ্ডের বাংলা থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ, এবং কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যবলয়ের ক্ষমতার কেন্দ্রায়নের প্রতি দ্বিচারী আগ্রহ। বিদ্রোহ বা সচেতন আত্মপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি, কলকাতাকে বাদ দিলে সাহিত্যকৃতি সম্পূর্ণ না হবার একটা বিপদের বোধ। সুতরাং কলকাতা হয়ে ওঠে কেন্দ্র ও প্রান্তের কথোপকথনের এক বিশেষ বিন্দু।

আমি ব্যক্তি হিসেবে মনে প্রাণে কলকাতার। জন্ম, শিক্ষা সবই কলকাতায়। কর্মসূত্রে অবশ্য উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারত সর্বত্র গিয়েছি, থেকেছি রাঁচির মত এক ছোট শহরে, যে শহর এখন ঝাড়খণ্ডের রাজধানী হলেও, যার মূল হয়ে ওঠাটা কিন্তু বাঙালির হাতেই। সেই প্রবাসীদের মধ্যেও সাহিত্যগোষ্ঠী ছিল, তাঁরা পত্রপত্রিকা বার করতেন, সেই প্রবাসে দেখেছি, যেমনটা পেয়েছি সুকুমার চৌধুরীর নাগপুরভিত্তিক আমারাঠাবঙ্গের আইডেন্টিটি রচনার সচেতন প্রয়াসে। কিন্তু অসমের বাঙালি ঠিক সেই অর্থে প্রবাসী নন। এই বিস্ময়টিই আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

কিন্তু উত্তরপূর্বে আসার আগে শিলচরের ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধেএকধরণের আবেগসর্বস্ব ধারণা সত্বেও (তা-ও তো বাংলাদেশের ২১ ফেব্রুয়ারির চেয়ে অনেকগুন ফিকে!) তৃতীয় ভুবন সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা তৈরি হয়ে ছিল না। প্রায় আন্দাজের বাইরে ছিল এই সত্য, যে ল্যান্ড লক্ড বরাক উপত্যকার বাঙালিরা, বা বরাক-সুরমা উপত্যকার বাঙালিরা, আর যাই হোন, প্রবাসী নন, এবং তাঁদের এক বিশাল অংশ এখনো মেঘালয়ে, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থান করেন, এঁদের জাতিসত্তা শত বহিঃকাতরতা সত্ত্বেও, প্রবাসী সত্তা নয়। এই বিশিষ্ট সত্তার সাথে মুখোমুখি সংলাপ রচনার সম্ভাবনা এই গুয়াহাটি শহরে বাস করতে না এলে ঘটত না এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। উত্তরপুবের বাঙালি মানে আবার ত্রিপুরার বাঙালিও, যাঁরা স্থানচ্যুত নন, স্বভূমে প্রোথিত। বাকিরা স্বভূমির সংজ্ঞা খুঁজছেন। শ্রীহট্টের বাঙালি দেশভাগের তীব্র বেদনা ভুলতে না ভুলতেই আবার প্রতারিত ও বিতাড়িত বোধ করেছেন মেঘালয়ে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। ক্ষমতার কাঠামোতে অসমিয়া বাঙালির সমস্যা, নিজেদের নিজভূমে পরবাসী ভাবার বেদনা, ভাষা আইনের দ্বিচারিতা। এবং শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে থেকেও স্বভূমে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছেন, বাংলার প্রতিষ্ঠিত মূল ভূখন্ডের সঙ্গে। কারণ কলকাতাবাসীর চোখেও তাঁরা প্রবাসী।

অর্থাৎ ক্ষমতাকেন্দ্র এখানে সহজে চিহ্নিত করা যাবে না। এখানে একাধিক বলয়ে একাধিক ক্ষমতার সাথে ডায়ালগ স্থাপনের দায় থেকে যাচ্ছে। একাধিক ক্ষমতাকেন্দ্রের সাথে বোঝাপড়া চালিয়ে যাওয়া, এবং অনেকগুলি ক্ষমতাবলয় হয়ত আসলে পেঁয়াজের মত, খোসা ছাড়াতে ছাড়াতেই সময় কেটে যাবে। কে আপন, কে পর, কোথায় আমি স্বজন, আর কোথায় দূরের পড়োশি, বুঝে উঠতে উঠতেই তৈরি হয়ে চলে জটিলতার ভার।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অর্ণব সেন-এর 'উদয়ন ঘোষে'র উপর আলোচনাটি। যেখানে, শতাব্দীর

বাংলা কবিতা নামক উত্তম দাশ সম্পাদিত গ্রন্থে, অনুপস্থিত বহু কবির মধ্যে উদয়ন ঘোষ, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী এবং বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের উল্লেখ করেছেন তিনি। উত্তরবঙ্গ ও বরাক উপত্যকার সুস্পষ্ট অনুপস্থিতি থেকে তিনি এই বিচারে এসেছেন যে কলকাতাকেন্দ্রিক কবিতার আত্মকেন্দ্রিকতা, কলকাতার বাইরে কবিতাচর্চার, বিপুল ও বিশাল বৈচিত্র্যময় জগৎকে উপেক্ষা করে চলেছে।

এই অজ্ঞতা সত্যিই কখনো বা ইচ্ছাকৃত, কখনো বা অনিচ্ছাকৃত, কেননা, দুষ্প্রাপ্যতা থেকেও অজ্ঞতার জন্য হয়। প্রয়োজনটা, আমার মতে, বেশি করে যোগাযোগের।

২ উত্তরপূর্বের কয়েকজন কবি : সমসাময়িকেরা

উত্তর পুবের যে কবিকে আমি সর্বপ্রথম চিনেছিলাম, তিনি রণজিৎ দাশ, এবং আইরনি এটাই যে সম্পূর্ণভাবে কলকাতার প্রেক্ষিতে। এই চলমান ক্লিন্ট ইস্টুড কলকাতার ভদ্রমন্ডলীকে স্তম্ভিত করে রেখেছিলেন তাঁর কবিতার যাদুকরী মায়ায়। বৈজ্ঞানিক সত্যের মত উদ্ভাসিত তাঁর ঈশ্বরের চোখ বইটির একটি আলোচনা স্বত:প্রণোদিতভাবে করতে গিয়ে দেখেছিলাম, আমি লিখে ফেলেছি, তিনি সেকুলার হয়েও ধার্মিক। তাঁর বইটিকে সত্যি আমার আস্তিক বলে মনে হয়েছিল, যখন তিনি বলেন, আমাদের শরীরের প্রতিটি ছিদ্রে আছে ঈশ্বরের চোখ।

রণজিৎ দাশের কবিতার সাথে আমাদের কথোপকথন শুরু হয়েছে বেশ কয়েকবছর আগে, কলকাতায়। অর্থাৎ, শিলচরের এক কবিকে আমরা চিহ্নিত করেছিলাম নিজেদের অজান্তেই। তারপর কত কত কবিতা প্রায় কেড়েকুড়ে পড়ে নিলাম আমরা। পড়তে পড়তে নিজেরাও লিখতে লাগলাম।

আজ, মনে হচ্ছে, এই কবি যে মাটির সন্তান, সেই মাটির সাথেও আমার একটি সম্পর্ক তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখানে আসবার পর ত্রিপুরার কবি প্রবুদ্ধসুন্দর কর, পল্লব ভট্টাচার্য প্রমুখের কবিতা যত পড়ার সুযোগ ঘটেছে, ক্রমশ দেখছি, রণজিৎ দাশের কণ্ঠ কতটাই প্রভাবক ও অভিভাবক এই সব তরুণতর কবিদের কলমের উপরে।

অমিতাভ দেবচৌধুরীর কবিতা পড়ি, সিজারিয়ান ও অন্যান্য নামে একটি কৃশকায় বইতে। আশির দশকে উনি কলকাতায় পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে অমিতাভ দেবচৌধুরী, যিনি কলকাতার মূল ধারায় কাগজে লিখলেও, অনিয়মিত ছিলেন কিছুটা, আমার অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠেন, ত্রিপুরার অক্ষর প্রকাশন থেকে বেরোন তাঁর বই, প্রথম উপন্যাস 'উপন্যাসের খোঁজে' ও ছোটদের জন্য 'হা রে রে রে' কিনি বইমেলায়, কলকাতাতেই।

২০০৯-এর গোড়ায় এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আসামাত্র, আবার পুনরুজ্জীবিত হয় সেই সম্পর্কটি। হাতে পাই তাঁর বই 'গত জন্মের কবিতা', আর অমিতাভ দেবচৌধুরীর কবিতা'। আজকের এই আলোচনায় আমার কাছে, 'গত জন্মের কবিতা' একটা দিক নির্দেশকের কাজ করবে। শিলচর বা বরাক উপত্যকার কবিতার ক্যানভাসে অমিতাভ দেবচৌধুরীর দেওয়া রংগুলি সচেতনভাবেই লাল, মেরুন ও বিষন্ন কালোর মধ্যে ঘোরেফেরে। আমাদের চিনতে সাহায্য করে এই প্রজন্মের বরাক উপত্যকার বাঙালিকে। যার ঘর, যার বিশ্ব, বার বার সরে সরে গেছে, যার দুনিয়া হারাতে হারাতে

পুনরুদ্ধৃত হয়েছে কাগজের ভেতরে, পেনসিলের ভাঙা শিস দিয়ে আঁকা ভোঁতা, ঝাপসা একটা পথের ভেতরে।

ত্রিপুরার কবি সমরজিৎ সিংহ সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ভাষায় কবিতা লেখেন। প্রকাশ করেন পত্রিকা 'দ্বাদশ অক্ষর'। ওই কাগজটিতে লেখার সুযোগ হয়েছিল কলকাতায় বসেই। ওঁর সাথে আলাপও সেখানেই। ওই কাগজের মান দেখে আমার গভীর প্রত্যয় ছিল ত্রিপুরার লেখালেখির উৎকর্ষ সম্বন্ধে। হাইলাকান্দির ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের পত্রিকাতে লেখাও আমার ঘটেছিল। আলাপ হয়েছিল দীপিকা বিশ্বাসের সঙ্গে, কলকাতারই এক অনুষ্ঠানে। আগরতলার প্রবুদ্ধসুন্দর করের কবিতাও পড়েছিলাম আগেই। রামেন্দ্রকুমার থেকে প্রবুদ্ধসুন্দর— এমন একটা ঋদ্ধ সংকলন বার করেছিলেন জমিল সৈয়দ-অঞ্জলি দাশ, তাদের 'এমাসের কবিতা' থেকে, সেটি পেয়েছিলাম আমার লেখালেখির গোড়াতেই। এখানে এসে তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম, তাঁর বই 'নৈশ শিস' পড়লাম। আপাতস্মার্টনেসের অবয়বে গভীর সংকটের চিত্রমালা রচনা করেন তিনি। মজা ও রসিকতা তাঁর লেখনভঙ্গির অনিবার্য উপাদান। একইসাথে অশোক দেবের 'বাইসাইকেলের বয়স', পল্লব ভট্টাচার্যের 'নিঃশব্দের নিচে', সমর দেব, মৃদুল দেবরায়, প্রদীপ মজুমদারের লেখা পড়লাম 'কাগজের নৌকা' নামের একটি অসামান্য পত্রিকার সংকলনে।

শিলং-এর স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্যের কবিতা আগে পড়ার সুযোগ ঘটেছিল, কৃত্তিবাস পত্রিকার পাতায়। এখানে এসে তাকে মুখোমুখি দেখতে পেলাম। একজন সম্পূর্ণ কবিতা নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তির সমগ্রতায় দেখতে পেলাম। তার নারীত্বসংবেদ তাকে আজকের তথাকথিত নারীবাদী নারী করেনি, তার লেখার মন্ত্রের মত লাইনগুলি আমাকে মনে করায় পুরনো কোন শাস্ত্রের কথা, আদিম কোন গুহাচিত্রের কথাও। সে সহজ, এমন সহজতা অনেক তপস্যায় কবির হাতে ধরা পড়ে। ১৯৯৪-এর জলসখি-তে নিজের আবির্ভাব সূচিত করেছিলেন কবি...২০০৬-এ কবিতার থেকে দূরেতে সেই মন্ত্র-প্রতিম অক্ষরমালার জনয়িত্রী এসে পৌঁছলেন একটি সমতলে।। পাহাড়ি কুয়াশার রহস্য ও পাহাড়ি ঝর্ণার মন্দ্র-কলস্বর, দুটোই যেন খানিক স্তিমিত হয়েছিল।। শিলং-এর স্বর্ণালী কিছুটা সচেতনে কিছুটা অবচেতনে নিজেকে এক আশ্চর্য কথনের ভেতরে ধরে রেখেছেন। আপাত-সরল সেই কথন, অথচ বৈদিক সামগানের মত সুরসমৃদ্ধ এবং গভীরতাকাঙ্ক্ষী সেই উচ্চারণ। ২০০৮-এ তাঁর বইয়ের নাম ইভ। এই নামকরণ বলে দেয়, ইতিমধ্যেই কবি হিসেবে স্বপ্রতিষ্ঠ তিনি এখন নিজের জন্য তৈরি করে নিচ্ছেন এক নতুন জগত, সেই সচেতন প্রয়াসে কোন কুণ্ঠা নেই তার নিজের একটি নারীবাদী কণ্ঠস্বর নির্মাণ করায়।

এক অতি তরুণ কবি বন্ধুকে পাই এখানে এসেই। তাঁর নাম অভিজিৎ চক্রবর্তী। কবিতায় আর্থসামাজিকতাকে ধরে রাখার শিল্প তাঁর করায়ত্ত। অথচ পরিবেশ প্রতিবেশ এসেছে কবিতার বস্তু হয়েই, কোন আরোপিত কথনে না। এই অভিজিৎ লেখেন, আমি ও অনন্ত সিরিজ। যেখানে অনন্ত এক খবরের কাগজ বিক্রেতা। রাবারের টিউবে বাঁধা অন্নপূর্ণা যোজনা, বা গ্রামে গ্রামে সরকারি নপুংসকতা বিলি করার কাজ, ইত্যাকার শব্দবন্ধে টের পাই, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এই কবি কীভাবে আশপাশের বাস্তবতাকে জড়িয়ে নিচ্ছেন তাঁর কবিতায়। অম্বাগাঁওয়ের হাটে/ আধাকাটা শুয়োরের

চর্বির ভাঁজে আমরা পাই তাঁর কবিতাকে। যা নতুন ও আক্রামক।। তিনি বলেন গ্রামের 'সমস্ত সংবাদ ঢুকে যায় সেরাপের বোতলে, আর চয়না দিদিমনিরা অঙ্কের খাতায় ২৯কে টেনেটুনে ৩১ করে দেয়'। বাস্তব-অবাস্তব সীমারেখা মুছে এই অনন্ত গ্রামযাত্রা ঘটে যে অভিজিতের সঙ্গে, তিনি সত্যি থাকেন টংলা নামে এক মফস্বলে। বিজ্ঞাপিত জগতের অনেকটা আড়ালে, সমস্ত লোকসমাজের থেকে দূরে মনন ও ধ্যানের কবিতা লেখেন।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রয়েছেন কবি সঞ্জয় চক্রবর্তী। তাঁর কবিতায় একরকমের ছোট ছোট ছবি রচনার কোলাজ। যা কখনো রাত্রির মত সংকেতময়। শের শায়রির মত সীমিত বপুতে গভীর অর্থভারে গর্ভিনী। 'কী নিয়ে গর্বিত তুমি, সামান্য প্রাণ!' অথবা 'তোর কাজল কেন চুরি করে রাত/ সে কী আরো ঘন কালো হবে বলে। রাত্রির অবাধ্য পাত্রে তাহলে /জমে উঠুক দু এক পাত্র ঘনবরষার।' প্রেম ও রহস্যে ঘনীভূত জীবনদর্শন, মিলিয়ে মিশিয়ে সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতা: বিষ খেতে খেতে দ্যাখো আমি কেমন/বিষমেঘে টৈটুম্বর/তাহলে তোর বাড়াভাতে কী দেব শ্যাম/ একবাটি আন্ধার, দু হাতা মরণের ঘুঙুর।'

রয়েছেন কবি ও গদ্যকার চিন্ময় দাশ। আপাদমস্তক কবি বিকাশ সরকার গৌহাটি বাসী, তবে বস্তুত সে উত্তরবঙ্গের কবি। কলকাতায় তার যাতায়াত আছে, দেশ পত্রিকার পাতায় তার অনেকগুলি কবিতা আগেই পড়েছিলাম, এখানে এসে তাকে দেখলাম, তার লেখার সবটাই প্রকৃতির সবুজ আর্তনাদ, কীটপতংগ এবং উদ্ভিদের ভেতরে উদ্ভিদের মত বেঁচে থাকা মানুষের কথা। 'আমি এক মাঝরাত্রি। ডিঙি নিয়ে বসে আছি লাভালাল নদীটির পাড়ে' অথবা 'পুরাতন মেঘ এসে বাদলের বিষ যায় থুয়ে' এই সব লাইনে বিকাশের নিজস্ব স্বর এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর তা এত থমথমে সবুজ, সজল এবং দেশজ অনুষঙ্গে ভারি, যে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগতে নিয়ে যান বিকাশ পাঠককে।

৩. নিসর্গভাবনা : আগে, পরে, চিরদিন

আর উত্তর পূর্ব মানেই তো নিসর্গ। অজস্র সবুজে ভারাক্রান্ত। এ অঞ্চলের কবিতার এক বিশেষ চরিত্রলক্ষণ নিসর্গভাবনা। প্রায় সব কবির কবিতাতেই লেগে থাকে শ্যামল মেঘের মায়া। এই বিশেষ প্রেক্ষণ শুরু হয়ে গেছে পঞ্চাশ-ষাটের কবিদের কবিতা থেকেই। আর সেটাই হয়ত সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

'ডাউকি চেরাপুঞ্জি থেকে যেসব লোক আসছে / ওরা খবর আনছে খুব ঘনঘোর বৃষ্টি হচ্ছে / ওদিকে দক্ষিণের দিকে' এ তো একেবারেই শিলং পাহাড়ের কবিতা। উদয়ন ঘোষের এই কবিতার সাথে সাযুজ্য রেখে স্বর্ণালী ভট্টাচার্য, আমাদের সময়ের কবি, লেখেন — আজ যাবো না নদীর কাছে/আজ যাবো না জলে/আমি কেবল বৃষ্টিধারা ছুঁইয়েছি দুই গালে। অথবা, স্বর্ণালীর আর একটি কবিতায় : 'জ্যোৎস্না ভাসায় মাঠ/স্নায়ুর ভেতরে ঢোকে আলো/গাছের শরীর থেকে/রূপালি পালক পড়ে খসে/বালিকা বিনুনি খুলে/সারা চুলে জোনাকি সাজায়/মাছমারা বুড়ো জেলে/ পরী দেখে চোখ কচলায়।' এই পরিণত কবির আর একটি কবিতা, পূর্বরাগ, এইরকম সহজিয়া :

'বৈষ্ণব পদাবলী থেকে মেঘ ভেসে এল
শিলং পাহাড়ে,
ওই মেঘ চন্দ্রাবলী, ওই মেঘ বিশাখা, ললিতা —
নীল পাহাড়ের ডাকে হাত খসে পড়ল গাগরি
তা ঝমাঝম বৃষ্টি বুঝি নামে
লাবান বাজারে।
আর এক ভীরু মেঘ আর এক ধবল কিশোরী
আজ তার অভিসার
শ্যাম মেঘটির কাছে যাওয়া
তারপর সারারাত আকাশে বিদ্যুতে খেলা হবে
শিলং পাহাড়ে আজ পূর্বরাগ অভিনীত হবে।'

প্রদীপ মজুমদারের কবিতায় পাচ্ছি;
'মেঘেদের প্রজাতন্ত্রে আমি সেই উদাসী বাউল
অচেনা মন্থর মৃদু জৈব বৃষ্টি হলে
চেটে দেখি জীবনের নুন
সাধন সঙ্গিনীভ্রমে অন্ধকার বুকে টেনে ধরি।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর (১৯৩৭-২০০৫) হাতে এই প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল কথা বলা,
জ্যান্ত এক প্রতিমা
পাটখেতের সবুজ বলিহারি, ডহরের ঘোরলাগা টান।

এ অঞ্চলের অন্যতম এক বিরাট মাপের কবি অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০), যাঁর 'এক যে ছিল গাছ/সন্ধে হলেই দু হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ' আমাদের কিশলয়-যুগের প্রীতিময়তার স্মৃতি। তাঁর কবিতায় জ্যোৎস্নার বিবরণ একটা রূপকথা সৃষ্টি করে :

ঘুম ভেঙে যায় অনেক রাত,
আকাশ-পাথরে সোনার চাঁদ,
হ্রদের উপরে ফটিক-ঢেউ
হঠাৎ করেছে খোদাই কেউ,
লাফ দিয়ে ওঠে রূপার মাছ,
চারদিকে ওঠে নীলার গাছ,
পান্না-চুনির বাঁধানো ঘাট,
সিঁড়ি উঠে যায় একশো আট।

আসলে প্রকৃতি এই কবির কাছে জীবন্ত। প্রাণময় বাঙময়। ঝড়ের কথা বলেন এই রকম। 'কালো মেঘ-সাপ হঠাৎ আকাশে ওঠে/ফণা তুলে ধরে ফোঁস ফোঁস করে ছোটে/চাঁদ নিভে যায়, পাহাড়

অন্ধকার/ দূরে শোনা যায় দৈত্যের চীৎকার'। এমন সেই ঝড়, যে 'জন্তুর মত গর্জন করে হু দ'।

'হঠাৎ দৌড়ে এসে/এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা/একটি ছিটের পিরান পরা শান্ত ছেলের মতো/ আমার কুটির পাশে। একটি পাতাবাহার।' এই অদ্ভুত চিত্রময় উপমাটির কবি দেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী (১৯০৭-২০০৩)।

এই অঞ্চলের এক অসামান্য কবি ও শব্দকর্মী উদয়ন ঘোষ লিখেছিলেন প্রকৃতির পটভূমিতে অন্যরকম আরবান শহুরে কবিতা।

'শিলচরের সিটি লাইট জ্বলে উঠলে মনে হয়/আলোকিত শহরের কাছাকাছি আছি'। এগুলির ভেতরে থেকে যায় এক ঝকঝকে বিষাদ। 'হারাঙ্গজাওয়ের পাহাড়ি রেল স্টেশনে/অস্পষ্ট আলোয় নীল ইউনিফর্ম পরা একটা লোক/ অপসৃয়মান রেলগাড়ির কাছে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে/ পাহাড়, জঙ্গল, ব্রিজ, অন্ধকার ছত্রিশটা টানেল/ রেলগাড়ির দোলায়/লণ্ঠনের স্মৃতি জেগে থাকে'। উত্তর-পূর্বে কবি-বলয়ের অন্যতম উজ্জ্বল এক নাম বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের (১৯৩৪-২০০৬) কবিতাতেও এই গ্রাম-গঞ্জ-ছোট শহর-উদ্বাস্তু নিবাস-প্রকৃতি-মানুষের শ্লেষাক্ত ইতিবৃত্ত।

'শীতের রোদ সে আজ শরণার্থী শিবির টপকে দেখে নেয়
উঁচু উঁচু কুলগাছে আলোকলতার ঢল,
এই তো ভ্রমণ, সদ্য স্নানের ভিতরকার কাঁটা,
জলের গরম আর নিশ্বাসের রেলইঞ্জিন আর
কুলকুচো, আঁসটে গন্ধের দেশে যেই ঘন্টা বাজল।
নটেশাকমাখা ভাত, কাঁসা ছিল উপুড় করানো
আঁচে, রোগমাখা গুটিবসন্তের দিনে
ভ্রমণপঞ্জিকা।'

তিনিই বলতে পারেন, অনেক বেড়ানো আছে ... অনেক অসম্ভব আছে।

৪. কবিতার যাদুকরী ক্ষমতা

উত্তরপুবের কবিতার আর এক বৈশিষ্ট্য মনে হয়, কবিতার যাদুকরী ক্ষমতার অগাধ বিশ্বাস। এক অলৌকিকের হাতে তুলে দেন কবিরা নিজেদের কবিতাকে, লিখে চলেন সান্ধ্যভাষায়, তাঁদের জীবন ও অতিজীবন সম্বন্ধে মিথ ও কাহিনির পরত, যা অনেক সময়ে আশ্রয় নেয় ধাঁধা ও শব্দের খেলায়। এই শব্দখেলাও কি তাঁদের যে সংকটাপন্নতার কথা প্রথমেই উচ্চারণ করে নিয়েছি তার সাথে যুক্ত? করুণাসিন্ধু দে (১৯৪২-২০০৫), তাঁর লেখায় আদ্যোপান্ত ঘটিয়ে যান এইসব আশ্চর্য, পাতেন শব্দফাঁদ। কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা — বইটির কথা আমরা খুব কম শুনি। অথচ এই বইয়ের ভেতরে পরিবেশের বিকীর্ণ বেদনা রয়ে যায়, পরিপার্শ্বের অবসিত ফুল তাঁকে আচ্ছন্ন করে। আবেগে দুরন্ত কবিতাও তিনি

লিখেছেন। 'বয়স জেগেছে অতলে যাবার, অতলে যাব ...। কড়া-রোদ্দুরে ঘরের অসুখ তুবড়ির মত ফাটিয়ে আমি/ ধোঁয়া ও ধূলিতে গড়াগড়ি দেব, কী ক্ষতি যদি বা বিপথগামী/ যেহেতু আমার ইচ্ছে হয়েছে কপাল খাবার, কপাল খাব।' করুণাসিন্ধু দে-র কবিতায় পরবর্তীর কবি অমিতাভ দেবচৌধুরী খুঁজে পান অসংখ্য ক্রিয়াপদ, মূলত আসা ও যাওয়ার গতিময় প্রক্ষেপণ। নৃত্যময় এই কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা আবার চেনায় উত্তরপুবের প্রাণরসকে, যাতে আছে আবেগী চলচ্ছক্তি। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতার ছন্দপ্রবণতা, পুরাণ-শাস্তর-গীতিকার ঢং যেখানে এসে মিলেমিশে যায়, লৌকিক অতিলৌকিক মিশে যেতে থাকে। ' সেই গোবর্ধন বট, ভয় ভয় শ্মশানের ধ্বজা/ মজা পুকুরের কোণে বৃষকাঠ, কেন যে মানুষ মরে যায়/মা বলেছে ষাট ষাট, শক্ত হাতে দিয়েছি দরোজা/ তেড়ে আসে বৃষকাঠ, ভয় ভয় শ্মশানের ধ্বজা।' রসময় এক রোমাঞ্চের জগতের দরজা এভাবেই খুলে দেন তিনি। তীব্র শ্লেষ, কিছুটা রসিকতাময় এক আত্ম-আঘাতপ্রবণতা নিয়েই তাঁর লেখালেখি পাঠক ও কবির ভেতরে কোন আড়াল রাখতে পছন্দ করে না।

কবিতাকে অন্ধকারে রহস্যময়ী সহোদরা করে রাখার নিরন্তর ব্যাপৃত এই কবিরা। যেমন, পল্লব ভট্টাচার্য বারে বারে প্রশ্নচিহ্নে বিক্ষত করেন তাঁর কবিতাকে, 'প্রশ্নচিহ্নের নিচে বসে থাকা, অসহায়'। অথবা স্ববিরোধিতায়। যে কবিতা 'রিডলড বাই কনট্রাডিকশনস',

জীবনেরই মত, স্ববিরোধে পূর্ণ ধাঁধাঁ এক একটি।
আমাদের সমস্ত চলাই কি তবে বাতাসের বিরুদ্ধতা করে ?
—
কার কাছে জানা যাবে, শেষ বাস চলে গেছে কিনা !
—
সত্য এমন এক পাখি, যা কেউ দেখেনি, অথচ বিশ্বাস করে আছে।
—
মন এমন এক কালো ও দীর্ঘ জাতীয় সড়ক, যা কোথাও পৌঁছয় না।

ঠিক সেই একই রকম খেলা খেলেছেন প্রবুদ্ধসুন্দর তাঁর কবিতায়:

'বিষাক্ত শরীর নিয়ে আজ/একাকী রজ্জুর মত শুয়ে থাকি।/হয়ত তা দেখে, কারো কারো সর্পভ্রম ঘটে।

অথবা, সারাজীবন একটি অলৌকিক শিশুর রহস্যচ্ছায়া, ক্রীড়াচ্ছল ও তার বিশ্বলয়, আমাদের হতবাক করে রাখে।

আমাদের স্বাভাবিক মৃত্যু, কোমা আর আত্ম্যহত্যার একক তবে প্রবুদ্ধসুন্দর।

অথবা, জয় মানে, নিজেরই বিষাক্ত লালায়, ক্রমশ জড়িয়ে যাওয়া।

যেমন পীযুষ রাউত লেখেন, সেন্ট্রাল রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে/ কেন জানি মনে হল, কবির শহর/আমারই তিলোত্তমা শহর/জননেতা ঘোষিত তিলোত্তমা শহর শিলচর/ এক অতিনোংরা ঘিঞ্জি বাজার।

উত্তর পূর্বে বাঙালিদের কবিতার চর্চা আমার কাছে আপ্লুত করার মত এই কারণেই, যে, এত বেশি বেশি করে এত গভীর অনুধাবনের সাথে পাঠের ও লেখার অভ্যাস আমি কলকাতায় বসে সর্বদা দেখিনি। কোন না কারণে, না উপলক্ষ্যকে ঘিরে মনকে ছড়িয়ে পড়তে দিই আমরা কলকাতাবাসীরা। এখানে এসে আলাপ গভীরতর হয়েছে এমন অনেক কবির সাথে, যাঁদের নামটুকু মাত্র জানতাম। হয়ত বা কয়েকটি কবিতা পড়েছিলাম।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এসে পেলাম ফিনিক্স তমসুক লেখাকর্মী সংলাপ ও মহাবাহুর মত পত্রিকায় চোখ রাখার সুযোগ। দেখলাম, লালন বা একা এবং কয়েকজন-এর পুরনো সংখ্যাগুলি

— বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের 'সাহিত্য' অথবা নতুন পরিচয় ও আলাপ : উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, প্র বুদ্ধসুন্দর কর, সঞ্জয় চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ সিংহ, মানিক দাশ, রমানাথ ভট্টাচার্য, অভিজিৎ চক্রবর্তী। শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বীরেন রক্ষিত প্রমুখ অগ্রজের কবিতা আমি পড়েছি, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে। সেটা যখন পড়েছিলাম, তাঁদের উত্তরপুবের পরিচয় ছাড়াই। এখানে আসবার পর এঁদের অনিবার্য উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হলাম। স্বপ্নিল পত্রিকার সম্পাদক করুণাসিন্ধু দে-র কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা পড়ার সুযোগ হয়নি আমার। এগুলির সাথে আমাকে আলাপ করালো উত্তরপূর্ব।

শেষ করার আগে আরো কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক নাম উচ্চারণ না করে পারছি না, যদিও সকলের কবিতারই আলোচনায় স্থান হল না স্থানাভাবে। রুচিরা শ্যাম, শিবাশিস চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু ঘোষ, কাব্যশ্রী বক্সী ভট্টাচার্য, তীর্থংকর দাশ পুরকায়স্থ, দেবাশিস তরফদার, সমর দেব, অনিতা দাস টান্ডন, সপ্তর্ষি বিশ্বাস, শেলী দাস চৌধুরী।

শেষ করব একটি অসামান্য কবিতা দিয়ে, যা এক সমাজনিষ্ঠ, বিবেকী কবির হাতের রচনা। কবির নাম নাম দিলীপকান্তি লস্কর। কবিতাটি প্রায় বাঁধিয়ে রাখার মত, উত্তরপুবের সমস্ত সমস্যাকে চিহ্নিত করার এক সবল থাপ্পড়।

অবস্থান

আমি কোত্থেকে এসেছি, তার জবাবে যখন বললাম:
করিমগঞ্জ, আসাম
তিনি খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন: বাঃ বেশ সুন্দর

বাংলা বলছেন তো!
একজন শিক্ষিত তথা সাহিত্যিকের যখন এই ধারণা, তখন
আমি আর কী বলতে পারি!
ওঁকে ঠিক জায়গাটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে বললাম:
বাংলা ভাষার পঞ্চদশ শহিদের ভূমিতে আমার বাস।
তিনি তখন এক্কেবারে আক্ষরিক অর্থেই
আমাকে ভিরমি খাইয়ে দিয়ে বললেন :
ও! বাংলাদেশ? তা-ই বলুন।